পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

পাক্ষিক আহ্‌মদী

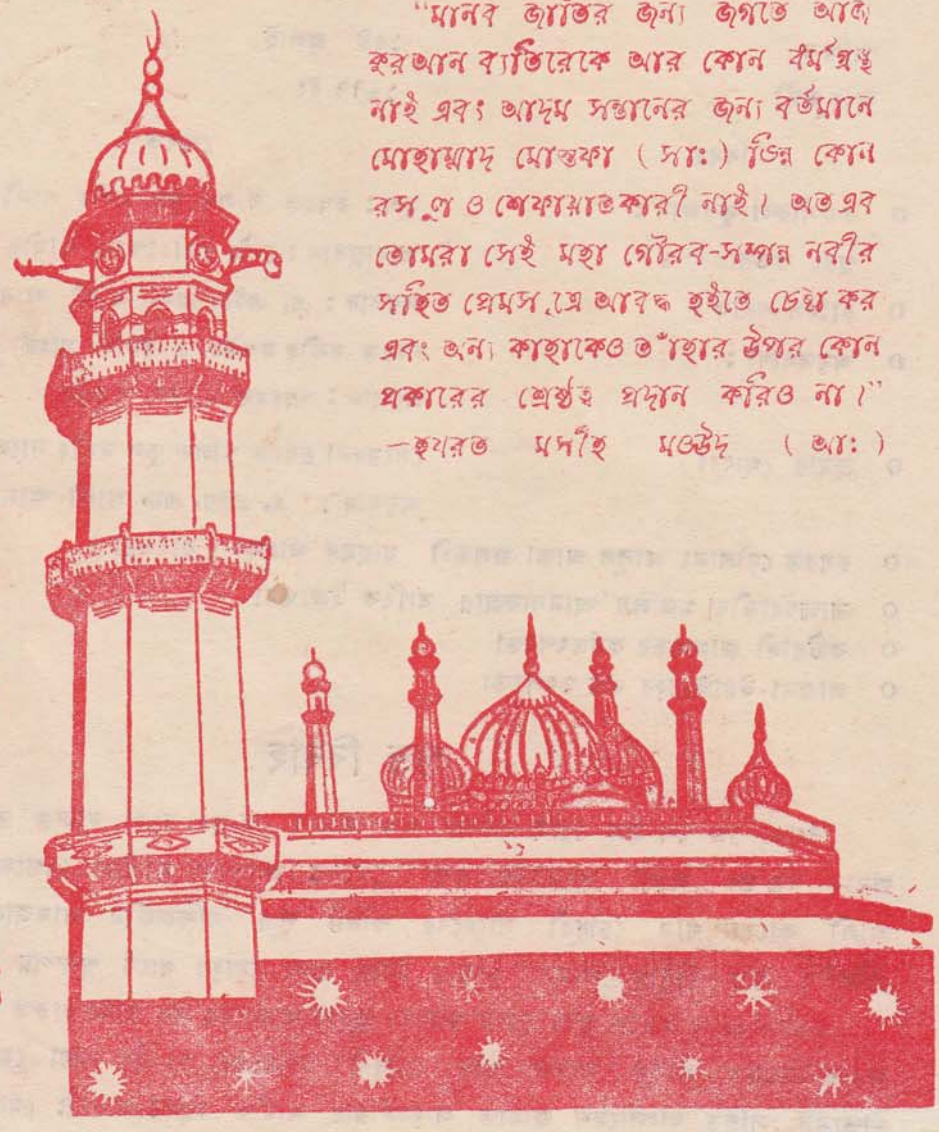

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

৩০ শে আষাঢ় ১৩৮৪ বাংলা : ১৫ই জুলাই ১৯৭৭ ইং : ২৭ শে রজব ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই জুলাই
১৯৭৭ ইং

৩১শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সুরা কওসার—(৪)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)	১
	ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ	আঃ
০ হাদিস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
০ অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	৮
	অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	
০ জুমার খোৎবা	সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)	১০
	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	
০ হযরত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী	মাহমুদ আহমদ (রাবওয়া)	২১
০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস আনসারুল্লার বার্ষিক ইজতেমা		২৮
০ কটিয়াদী জামাতের কর্মতৎপরতা		২৮
০ লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র কর্ম তৎপরতা		২৯

শুভ বিবাহ

বিগত ১৯ শে জুন রোজ রবিবার বাদ নামায জোহর ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে জনাব ভিজির আলী সাহেবের কন্যা মোসাঃ রুখসানা নাসীরা বেগমের সহিত জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র বশিরুদ্দীন আফজাল আহমদ খান চৌধুরীর শুভ বিবাহ পনের হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

তেমনিভাবে ২৪শে জুন, রোজ শুক্রবার জুমার নামাযের পর ঢাকা দারুত তবলীগ মজজিদে জনাব মরহুম আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাঃ জিন্নতুন্নেসা খাতুনের সহিত বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার আমীর মহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেবের তৃতীয় পুত্র জনাব শরিফ আহমদের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

উভয় বিবাহের খোৎবা প্রদান করেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরব্বী, ঢাকা এবং পরিশেষে মহতারম আমীর সাহেব উপস্থিত শুধীমণ্ডলী সহ ইজতেমায়ী দোয়া করেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন, আল্লাহতায়ালা যেন উভয় বিবাহ সর্বাঙ্গীনরূপে বাবরকত ও কল্যাণজনক করেন। আমিন।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ় ১৩৮৪ বাং : ১৫ই জুলাই ১৯৭৭ ইং : ১৫ই ওফা ১৩৫৬ হিজরী শামসী

'তফসীরে কবীর'—

সূরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)। —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪) হযরত মুসা (আঃ) এক কেতাব প্রাপ্ত হন এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-ও এক কেতাব প্রাপ্ত হন। কিন্তু হযরত মুসা (আঃ)-এর পর ক্রমাগত নবীগণ তাঁহার কেতাবের শিক্ষাকে সচল রাখিবার জন্য আগমন করা সত্ত্বেও, তাঁহার কেতাব সংরক্ষিত হয় নাই। অথচ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর ১৩০০ বৎসর যাবৎ তাঁহার শিক্ষাকে সচল রাখিবার জন্য কোন নবীর প্রয়োজন হয় নাই এবং কোন নবী আগমন করেন নাই, তথাপি তাঁহার আনিত কেতাব আজও সংরক্ষিত আছে। ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে যখন হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করেন, তখন তওরাত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ইহুদীগণের পুস্তকে লিখিত আছে যে যখন বাদশাহ নবুখত্ নাসর্ দাউদ (আঃ)-এর শহর এবং গির্জাগুলিকে ধ্বংস করে এবং ইহুদীগণকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া কতক আফগানিস্তান, কতক ইরান ও কতককে কাশ্মীরে বসাইয়া দেয়, তখন বাদশাহ তওরাত গ্রন্থের সব কপি অগ্নিসাৎ করিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। তখন ওযের নবী কয়েকজন তওরাতগ্রন্থবিদসহ মিলিত হইয়া কয়েকজন লেখককে দিয়া তওরাত কেতাবকে নূতন করিয়া লিপিবদ্ধ করান। (Apocryphal Esdras 14 দ্রষ্টব্য)। সুতরাং হযরত মুসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ছয়শত বৎসরের পরেই তওরাত গ্রন্থ বিকৃত হইয়া যায়। ইহার প্রমাণ তওরাত গ্রন্থের মধ্যেই বর্তমান রহিয়াছে। তওরাত পুস্তকে লিখিত আছে, "খোদার বান্দা মুসা খোদার কথা অনুযায়ী মোয়েব দেশে

মৃত্যুবরণ করেন।" (৩৪ : ৫)। ইহা কি হযরত মুসা (আঃ)-এর ইলহাম হইতে পারে? অতঃপর আরও লিখা আছে, "সেই সময় হইতে এ যাবৎ বনি ইসরাইলের মধ্যে মুসার অনুরূপ নবী হন নাই, যাঁহার সহিত খোদা মুখোমুখী কথা বলিয়াছেন।" (৩৪ : ১০)। ইহা কি মুসা (আঃ)-এর ইলহাম হইতে পারে? উক্ত কেতাবে আরও লেখা আছে, "তাহারা তাঁহাকে মোয়েবের এক উপত্যকায় দাপন করে। আজ পর্যন্ত কেহ সেই কবরের সন্ধান জানে না।" (৩৪ : ৬০)। স্পষ্টতঃই এই কথাগুলি কেহ পরবর্তীকালে তওরাতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। এই উদ্ধৃতিগুলির দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট যে কেতাব নাযেল হইয়াছিল, উহা সেই কেতাব নহে। যদি কুরআনে লিখা থাকিত যে, "ইহার পর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মৃত্যু বরণ করিলেন", তাহা হইলে খৃষ্টান, ইহুদী এবং হিন্দুগণ কি স্বীকার করিত যে কুরআন সংরক্ষিত আছে? কুরআন শরীফে তাহারা এরূপ কোন হাওয়ালা পাইলে, তৎক্ষণাৎ উহা বাহির করিয়া চাপিয়া ধরিবে, কুরআনে হস্তক্ষেপ হইয়াছে। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত হাওয়ালাগুলি যেমন একদিকে প্রমাণ করিতেছে যে, তওরাত কেতাব বিকৃত হইয়াছে, তেমনি ঐগুলি ইহাও প্রমাণ করিতেছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর পরবর্তী নবীগণ তওরাতের সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই এবং উহার মধ্যে রদবদলকে ঠেকাইতে পারেন নাই। কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর যে কেতাব নাযেল হইয়াছিল, উহা আজও সংরক্ষিত আছে এবং উহার মধ্যে যের-বরও বদলায় নাই। অথচ তাহার পর এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোন নবীর আগমন হয় নাই। মুইর ও নলডেকের ন্যায় বিদ্বেষী খৃষ্টান লেখকগণ পর্যন্ত ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে কুরআন মজীদ যে আকারে নাযেল হইয়াছিল, উহা আজও সেই আকারে বর্তমান। পদে পদে ইসলামের ত্রুটি ধারণে সচেষ্ট মুইর লিখিয়াছে,

"There is otherwise every security intrnal and external that we possess the text which Muhammad (P&B) himself gave forth and used." অর্থাৎ, "এতদ্ব্যতিরেকে আমাদের নিকট সর্বপ্রকার আভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক নিশ্চিত প্রমাণ রহিয়াছে যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যে কেতাব দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছিলেন, উহাই আমাদের হস্তে রহিয়াছে।" (Life of Muhammad, page 28)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঘোর শত্রুও পবিত্র কুরআনের সংরক্ষিত থাকার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পেশ করিতে পারে নাই। ইহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কত বড় ফযিলত নির্দেশ করিতেছে।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারে, আপনারা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে নবী বলিয়া মানেন। সুতরাং আপনারা কিভাবে বলিতে পারেন যে, কুরআন করীমের হেফাযতের জন্য কোন নবী আসেন নাই?" আল্লাহতায়ালা কুরআন মজীদের শাব্দিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই করিয়া দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কখনও কোন রদ বদল সম্ভব নহে। হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর আসা না আসার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার আগমন কুরআন করীমের শাব্দিক সংরক্ষণের খোদাই মোজেযাকে সন্দেহযুক্ত করে না। ইহার মধ্যে তাঁহার কোন দখল ছিল না। কেয়ামত পর্যন্ত যদি একজন মোজাদ্দেদও না আসেন, তবু কুরআন করীমের শাব্দিক সংরক্ষণ অটুট থাকিবে। ইহা আল্লাহতায়ালার ওয়াদা যে তিনি কুরআন করীমের সংরক্ষণ করিবেন এবং তাঁহার ওয়াদা অটল।

(৫) হযরত মুসা (আঃ) যখন মিশর ত্যাগ করেন এবং ফেরাউন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে, কুরআনের আয়াত দ্বারা ইহা সাব্যস্ত যে, তখন তাঁহার অনুগামি কওম ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারা ভাবিয়াছিল যে ফেরাউনের হাত হইতে তাহারা বাঁচিতে পারিবে না। তাহারা চিৎকার করিয়া হযরত মুসা (আঃ)-কে বলিল, انا لمدركون (শোয়ারা-৪র্থ রুকু) "হে মুসা, আমরা ধরা পড়িয়াছি।" তখন হযরত মুসা (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, كلا ان معى ربى سيهدين (ঐ-তৃতীয় রুকু)। "ইহা কখনও হইতে পারে না, খোদাতায়ালা আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদিগকে দুশমনদের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া লইবেন।" বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন এবং ফেরাউন তাহার লস্করসহ লোহিত সাগরে ডুবিয়া মরিল। অনুরূপ ভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন হিজরত উপলক্ষে মক্কা হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন, দুশমনগণ এক পারদর্শী অনুসন্ধানকারীর সাহায্যে ঠিক যে স্থানে আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। অনুসন্ধানকারী বলিল, "হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চয় এই গুহায় লুকাইয়া আছেন, এবং তিনি যদি এখানে না থাকেন, তাহা হইলে তিনি আকাশে চলিয়া গিয়াছেন।" দুশমনেরা তখন এত নিকটে যে হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘাবরাইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল! দুশমনগণ এত নিকটে যে, তাহারা নীচের দিকে ঝুঁকিয়া একটুকু তাকাইলেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে।" আঁ-হযরত (সাঃ) একান্ত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হে আবু বকর। তুমি ঘাবরাইতেছ কে? (সুরা তওবা, ৬ষ্ঠ রুকু)। ان الله معنا "আল্লাহতায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।" ফলতঃ দুশমনগণ তাঁহাদের এত নিকটে আসিয়াও তাহারা অনুসন্ধানকারীর কথায় আস্থা স্থাপন করিল না, তাহারা গুহার মধ্যে তাকাইল না, তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল, তাহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে হাতের নিকটে পাইয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিল না।

হযরত মুসা (আঃ)-ও বলিয়াছিলেন, "খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।" আঁ-হযরত (সাঃ)-ও একই কথা বলিয়াছিলেন, "খোদাতায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।" হযরত মুসা (আঃ)-এর দুশমনের ধ্বংসের ইতিবৃত্তি ইহাই যে, হযরত মুসা (আঃ) যখন সাগরে নামিলেন, তখন ভাটা, এবং ফেরাউনও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ভাটার মধ্যেই সাগরে নামিল। কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) ভাটার মধ্যেই সাগর পার হইয়া কূলে উঠিলেন এবং ফেরাউন সাগরে থাকা কালেই জোয়ার আসিয়া তাহাকে লস্কর সমেত ডুবাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। হযরত মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীগণ আজও বলে, "ইহার মধ্যে মোজেযার কি আছে? ইহা তো জোয়ার ভাটার খেলা ছিলো।" কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, তিনি যে গুহায় লুকাইয়াছিলেন, দুশমন অব্যর্থ সন্ধানীর সাহায্যে সেই গুহার কিনারায় উপস্থিত, সন্ধানী দৃঢ় কণ্ঠে জানাইতেছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) নিশ্চয় সেই গুহার মধ্যেই আছেন, অথচ দুশমন বা সেই সন্ধানীর মাথা নীচু করিয়া গুহার মধ্যে তাকাইবার ক্ষমতা হইল না। তাহারা সকলেই তাহাদের সকল শ্রমকে পণ্ড করিয়া বেকুবের ন্যায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল।

অতঃপর কাফেরগণ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রেপ্তারকারীকে একশত টাকা পুরস্কার দানের ওয়াদা ঘোষণা করিল। এই ঘোষণা শুনিয়া আরবগণ চারিদিকে দৌড় দিল। প্রত্যেকেরই মনে আশা, আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ধরিতে পারিলে তাহার ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। এক শত উট লাভ করিতে পারিলে, অবস্থা সচ্ছল হইয়া যাইবে। তখনকার দিনে ইহা এক বড় রকমের পুরস্কার ছিল। তখনকার দিনে একশত উটের মূল্য লক্ষাধিক টাকা হইবে। দৈবক্রমে এক ব্যক্তি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সন্ধান পাইয়া গেল। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিল এবং পুরস্কার লাভের নিশ্চিৎ আশায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। যখন সে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকটবর্তী হইল, তখন সহসা তাহার ঘোড়া হোঁচট খাইল এবং উহার পা মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ধ্বসিয়া গেল। আরবগণের দস্তুর অনুযায়ী তখন সে ইতিকর্তব্যনির্ণয়ের জন্য তীর ছুড়িল। ফল বাহির হইল, 'অগ্রে বাড়িও না'। কিন্তু একশত উট পুরস্কার লাভের লোভ কিভাবে সংবরণ করা যায়! সে পুনরায় অগ্রসর হইল। এবার কিছুটা যাইতে না যাইতে আবার তাহার ঘোড়ার পা মাটির মধ্যে ধ্বসিয়া পেট পর্যন্ত ডুবিয়া গেল। ইহাতে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং বুঝিল ব্যাপার গুরুতর। সে তাহার মনোভাবের পরিবর্তন করিল এবং আগাইয়া গিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট আত্ম-সমর্পন করিল এবং অভয় চাহিল। সে বলিল, "আমি পুরস্কারের লোভে আপনাকে ধরিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু দৈব বিপদে আমার চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। আমি

বুঝিয়াছি, আপনি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত সত্য নবী। একদিন আপনি জয়যুক্ত হইবেন। আমি আপনার পশ্চাদ্ধাবন হইতে ফিরিয়া যাইতেছি। আপনি আমাকে এক অভয়-পত্র লিখিয়া দিন, যাহাতে বিজয়ের দিনে সংশ্লিষ্টগণ আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন।" তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আদেশে হযরত আবু বকর (রাঃ) লিখিয়া দিলেন যে মুসলমানগণ যখন বিজয় লাভ করিবেন, তখন যেন তাঁহারা তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) আরও আগে বাড়িলে আর একদল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া তাঁহার সমুজ্জল চেহারা দেখিয়া ও তাঁহার সুমধুর কুরআন পাঠ শুনিয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিয়া ফিরিয়া যায়।

সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে গ্রেপ্তার করার প্রয়াস একবার নহে, বরং তিন বার ব্যর্থ হইয়া যায়। ফেরাউন যখন হযরত মুসা (আঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবন করে, তখন সে তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া লয়। কিন্তু গারে-সওরে অতি নিকটে গিয়াও দুশমন আঁ-হযরত (সাঃ)-কে দেখিতে পাইল না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুশমন মাথা নত করিয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় ক্ষেত্রে দুশমনদল ঈমান আনিয়া ফিরিয়া গেল। নিমজ্জিত হইবার কালে ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-এর খোদাকে চিনিতে পারিল। পবিত্র কুরআনে লিখা আছে, ফেরাউন ডুবিবার সময় বলিয়া উঠে, "আমি মুসা এবং ফেরাউনের খোদার উপর ঈমান আনিলাম।" উহার উত্তরে খোদাতায়ালা বলেন, "তুমি একান্ত শেষ সময়ে ঈমান আনিয়াছ। এখন আর তুমি নাজাত পাইতে পার না, তবে তোমার দেহকে সংরক্ষিত করা হইবে, যাহাতে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য তুমি দৃষ্টান্ত হও।" কিন্তু যাহারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রেপ্তার করার জন্য আসিয়াছিল, তাহারা জীবিত রহিল এবং তাহারা তাহাদের জীবদ্দশাতেই তাঁহার উপর ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করে। একজন তো ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য এক অভয়নামা লিখাইয়া রাখিল এবং পর-বর্তীকালে তাহার জীবদ্দশাতেই যখন মুসলমানেরা বিজয় লাভ করেন, তখন তাঁহারা তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। এই ঘটনাগুলি হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রাধান্যকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

(৬) হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মধ্যে আর এক সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। হযরত মুসা (আঃ)-এর দুশমন ধ্বংস হইয়া যায়, অথচ তিনি তাহার দুশমনের রাজ্যের উপর দখল পান নাই। বরং তিনি তাঁহার অনুগামী সহ বহুকাল যাবৎ ঘুরিয়া বেড়ান। পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দুশমন কোরেশগণ যখন পরাজয় বরণ করিল, তখন তিনি তাহাদের রাজ্যের উপরও অধিপত্য লাভ করেন। হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর তাঁহার ফযিলতের ইহা আর এক উজ্জল প্রমাণ। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রসুলের এতায়াত (আনুগত্য), সুন্নত অনুসরণ ও বেদায়াৎ বর্জন এবং ভাল বা মন্দ নমুনা প্রদর্শনের গুরুত্ব

৯৫। হযরত ইবরায বিন সারিয়াহ্ (রাঃ) বলেন : একবার আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বড়ই চিত্তাকর্ষক ওয়ায ফরমাইলেন। তদ্বারা আমাদের হৃদয় ভয়ে পূর্ণ হইল, চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমরা নিবেদন করিলাম : আল্লাহর রসুল (সাঃ), ইহা ত শেষ ওয়ায মনে হয়। আপনি আমাদিগকে শেষ কিছু উপদেশ দিন। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্তায়ালার 'তক্ওয়া' (তাঁহাকে বর্মরূপে গ্রহণের) এবং 'ইতায়াত' (আনুগত্য) ও ফরমাবরদারী (আদেশ পালন) করিবার জন্য উপদেশ দিতেছি, তোমাদের আমীর (নেতা) কোনো হাবশী গোলাম (কাফ্রী কৃতদাস) নিযুক্ত হইলেও। যে তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকিবে, সে অনেক বড় বড় অনৈক্য দেখিতে পাইবে। তোমাদের কর্তব্য, তোমরা আমার এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত রাশেদীন ('খুলফা') খলিফাগণের 'সুন্নত' (রীতি) মানিয়া চলিবে। উহা দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া রাখিবে। বেদয়াত (ধর্মে অননুমোদিত নূতন নূতন কথার) সৃষ্টি হইতে বিরত থাকিবে। কারণ, তাহা বিপথগামীতা ও গুমরাহীর দিকে লইয়া যায়।

(আবু দাউদ, কেতাবুস্ সায়া, বাবু ফি লযুমিস্ সুন্নাহ্ ; তিরমিযি, ২ : ৯২ পৃঃ)

৯৬। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে ভাষণ দান করিলেন। তাঁহার চক্ষু লাল হইয়া গেল। কণ্ঠ উচ্চ হইল। আবেগ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল। মনে হইতেছিল, যেন তিনি কোন অভিযানকারী লস্কর সম্বন্ধে আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি (সাঃ) বলিলেন, ঐ বাহিনী তোমাদিগকে প্রত্যুষে বা সন্ধ্যায় আক্রমণ করিবে। তিনি (সাঃ) ইহাও ফরমাইলেন : এখন আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, সর্বাপেক্ষা ভাল কথা আল্লাহ্ তায়ালার কেতাব এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা (তরিকা) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর 'তরিকা' (অনুসৃত পথ ও নিয়ম)। সর্বাপেক্ষা মন্দ কার্য ধর্মে 'বেদায়াত' পয়দা করা। প্রত্যেক 'বেদায়াত' (ধর্মে অননুমোদিত নূতন রীতি-নীতি) বিপথগামীতার দিকে নিয়া যায়। তিনি (সাঃ) আরো বলিলেন : প্রত্যেক বিশ্বাসীর (মুমেনের) সহিত আমার সম্পর্ক তাহার প্রাণ অপেক্ষাও নিকটবর্তী

সম্পর্ক। কেহ কোন ধন সম্পদ ছাড়িয়া গেলে, উহা তাহার পরিবার পরিজন পাইবে এবং কেহ কোন কর্জ রাখিয়া গেলে, বা নিরূপায় সন্তান রাখিয়া গেলে, তাহার দায়িত্ব আমার।"

('মুস্‌লিম,' কেতাবুল জুমুয়া, বাবু তখ্‌-ফিফুস্‌-সালাত ওয়াস্‌সুন্নতে ওয়াল্‌ খুৎবাহ্‌)

৯৭। হযরত আবু হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "যে পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া রাখি এবং তোমাদিগকে কিছু বলি না, তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া রাখিবে অর্থাৎ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। কারণ, তোমাদের পূর্বে অনেক জাতি বা লোক এই জন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদের নবীগণকে অনেক প্রশ্ন করিত। কিন্তু যখন তাহাদিগকে উত্তরে আদেশ দেওয়া হইত, তখন তদনুযায়ী কাজ করিত না। সুতরাং, যে পর্যন্ত আমি স্বয়ং তোমাদিগকে কোনো বিষয় হইতে বোধ করি, তাহা হইতে তোমরা খ্যান্ত থাকিবে এবং যে কাজের হুকুম দেই, তাহা যথাসাধ্য পালন করিবে।"

(বুখারী, কেতাবুল ই'তেসাম, বাবুল ইকতেদা বিসুনানে রাসুলিল্লাহে)

৯৮। হযরত আবু সা'লব আল্‌-খুশানী জুরসুম বিন্‌ নাশের (রাঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আল্লাহ্‌-তায়ালা কতিপয় ফরজ (কর্তব্য) নির্ধারণ করিয়াছেন। তোমরা তাহা নষ্ট করিবে না। তিনি কতক 'সীমা' নির্ধারিত করিয়াছেন। তোমরা তাহা অতিক্রম করিবে না এবং তাহা দলিতও করিবে না। তিনি কোনো কোনো জিনিষ 'হারাম' (নিষিদ্ধ) করিয়াছেন। তোমরা তাহা হালাল করিবে না। কোনো কোনো বিষয় তিনি উল্লেখ করেন নাই, শুধু তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ক্রমে। তিনি ভুলেনও নাই এবং ভ্রমের বষবর্তীও হন নাই। সুতরাং, ঐ গুলি সম্বন্ধে বাড়াপাড়ি করিয়া জিজ্ঞাসাও করিবে না, অতি সন্ধানী সাজিবে না।" ('দার কুত্‌নি')

৯৯। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যে ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে বেদয়াত, অর্থাৎ এরূপ কোনো নূতন রসম-রীতি পয়দা করে যাহা ধর্মে অনুমোদিত নয়, তাহা হইলে সেই 'রসম রীতি' বাতিল এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"

(বুখারী, কেতাবুস সুলাহ, ১: ৩৭১ পৃঃ এবং ২: ১০৯২ পৃঃ)

১০০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাযিঃ) বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: যে ব্যক্তিই 'না-হক' বা অন্যায়রূপে নিহত হয়, তাহার গোনাহর কিছু অংশ আদম আলাইহেস সালামের প্রথম পুত্রও পায়, এজন্য যে, সর্ব প্রথম সে-ই হত্যা করিবার রীতি প্রচলিত করিয়াছিল।" (বুখারী কেতাবুল আম্বিয়া, বাবু খালকে আদামা ও যুর্‌রিয়াতেহী)

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে ধারাবাহিক অনুবাদ): —এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

শানে-খতামান্নাবিয়ীন (সাঃ আঃ)

জগতে কোটি কোটি পুণ্যাত্মা গত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হইবেন। কিন্তু আমরা সব চাইতে উত্তম, শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, খোদাতায়ালার সেই মহাপুরুষকেই পাইয়াছি, যাঁহার পবিত্র নাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। "ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নবীয়ে ইয়া আইহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহে ওয়া সাল্লেমু তসলীমা।"

যে সকল নবীর অবস্থা কুরআন করীমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয় নাই, তাঁহাদের কথা তো ছাড়িয়াই দিন, আমরা শুধু সেই সকল নবীর সম্পর্কেই স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতেছি, যাঁহাদের উল্লেখ কুরআন করীমে আসিয়াছে। যেমন—হযরত মুসা, হযরত দাউদ, হযরত ঈসা আলাইহিমুস্সালাম এবং অপরাপর নবীগণ। সুতরাং খোদাতায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জগতে আগমন না করিতেন এবং কুরআন শরীফ নাযেল না হইত, এবং সেই সকল বরকত ও কল্যাণ আমরা সচক্ষে দর্শন না করিতাম, যাহা আমরা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা হইলে ঐ সমস্ত বিগত নবীর সত্যতা আমাদের নিকট সন্দেহযুক্ত অবস্থায় থাকিয়া যাইত। কেননা শুধু কেস্সা কাহিনী দ্বারা কোন বাস্তব সত্য হস্তগত হইতে পারে না, আবার এমনও হইতে পারে যে সেই সকল কেস্সা কাহিনী সঠিক নহে, এবং ইহাও সম্ভবপর যে তাঁহাদের দিকে আরোপিত মো'জেযা বা অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ সর্বৈব অতিরঞ্জন ছড়া আর কিছু নয়। কেননা এখন উহাদের কোন নাম-গন্ধ বা চিহ্ন পর্যন্ত বিদ্যমান নাই। বরং ঐ সকল পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থের মাধ্যমে তো খোদাতায়ালারও সন্ধান পাওয়া যায় না, এবং নিশ্চিত বুঝিতে পারি না যে, খোদাতায়ালাও মানুষের সহিত কথা বলেন, তাহাকে বাক্যালাপে ভূষিত করেন। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইে ওয়া সাল্লামে-এর আবির্ভাবের দ্বারা ঐ যাবতীয় কেস্সা কাহিনী বাস্তব সত্যরূপে উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমরা শুধু উক্তি হিসাবে নয় বরং বাস্তব ঘটনা হিসাবে ইহা সম্যক উপলব্ধি

করি যে, ঐশী বাক্যালাপ (মূকালমা ইলাহিয়া)-এর প্রকৃত স্বরূপ কি এবং খোদাতায়ালার নিদর্শন কিরূপে প্রকাশিত হয়, এবং কিভাবে দোওয়া কবুল হয়—এ সব কিছুই আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামে-এর পায়রবী ও আজ্ঞানুবর্তিতায় লাভ করিয়াছি, এবং যাহা অতীত কিস্সা কাহিনীরূপে বিজাতিরা বর্ণনা করে, তাহা সবই আমরা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং আমরা এমন এক নবীর আঞ্চল ধারণ করিয়াছি যিনি খোদা-নোমা বা ঐশী দর্পন স্বরূপ। কোন এক বুজুর্গ এ ছন্দ দুইটি কি উত্তম রচনা করিয়াছেন :

محمد عربی بادشاہ دوسرا - کرے ہے روح قدس جسکے درکی دربانی
اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پر کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی

(অর্থাৎ, মুহাম্মাদ-আরবী (সাঃ) দুজাহানের বাদশাহ্, রূহুল কুদুস (জিব্রাইল) যাঁহার দুয়ারে দারোয়ানী করেন, তাঁহাকে খোদা তো বলিতে পরি না কিন্তু তাঁহার মর্যাদা উপলব্ধির মধ্যেই খোদা উপলব্ধি নিহিত রহিয়াছে।”)

আমরা কি ভাষায় খোদাতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব, যিনি আমাদিগকে এরূপ নবীর পায়রবী ও অনুগমনের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন, যিনি পুণ্যবানদের পবিত্র আত্মা সমূহের জন্য ভাস্বর দিবাকর স্বরূপ, যেমন জড় বস্তুগুলির জন্য এই সূর্য। তিনি তিমিরাচ্ছন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং জগতকে স্বীয় জ্যোতির দ্বারা আলোকিত ও জ্যোতির্ময় করিয়াছেন। তিনি ক্লান্ত হন নাই, পরিশ্রান্তও হন নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না আরব ভুমিকে সম্পূর্ণরূপে শির্ক মুক্ত করেন। তিনি তাঁহার সত্যতার নিজেই প্রমাণ। কেননা তাঁহার নূর প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান এবং তাঁহার পায়রবী মানুষকে এমনভাবে পবিত্র করে যেমন এক পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ নদীর পানি ময়লা বস্ত্রকে পরিষ্কার করে। এমন কে আছে যে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা সহকারে আমাদের নিকট আসিয়াছে এবং আসিয়া সে ঐ নূর প্রত্যক্ষ করে নাই এবং এমন কে আছে যে, এই দুয়ারে কষাঘাত করিয়াছে কিন্তু উহা তাহার জন্য খোলা হয় নাই ? পরন্তু আক্ষেপ, অধিকাংশ মানুষের এই স্বভাব যে, পার্থিব জীবনকেই তাহারা বাছিয়া লয় ও ভালবাসে এবং তাহারা চায় না, নূর তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করুক।” (চাশমায়ে-মা'রেফত, পৃঃ ২৮৮)

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

জুমার খোৎবা

সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[স্থান—মসজিদ আকসা, তাং—১০/১১/৭২ ইং]

খোদায়ী জামাত সমূহের বিরুদ্ধে সর্বদা দৈহিক ও মানসিক কষ্ট প্রদানের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়।

ইলাহী জামাত ঐগুলির কোনো প্রভাব গ্রহণ না করিয়া তাহাদের মধ্যে শৈথিল্য, দুর্বলতা বা নতি আসিতে দেয় না।

আহ্‌মদীয়া জামাত এক খোদায়ী জামাত বলিয়া আধ্যাত্মিক প্রফুল্লতা, কর্মোৎসাহ এবং অদম্য ত্যাগের এক প্রকৃত আদর্শ।

আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন সর্ব প্রকার বিপদাপদের মোকাবিলা সেই কুরআনী দোওয়ার সহযোগে করি, যাহা এই উদ্দেশ্যে খোদাতালা আমাদিগকে শিখাইয়াছেন।

সুরাহ্ ফাতেহার পর হুজুর নিম্ন লিখিত আয়াতগুলি তেলাওয়াত করেন :

فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ٥ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ٥ (ال عمران ١٤٧-١٤٨)

["ফমা-ওয়াহানু লেমা আসাবাহুম্ ফি সাবিলিল্লাহে ওমা জায়ুফু ওমাস্তাকানু ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুস সাবেরীন। ওমা কানা কাওলুহুম্-ইল্লা আন্ কালু : 'রাব্বানাগ্-ফের লানা জুনুবানা ওয়া ইস্‌রাফানা ফি আমরেনা ওয়া সাব্বেৎ আক্‌দামানা ওয়ান্‌সুরনা আলাল্ কাওমিল্ কাফেরীন।"—সুরা আলে-ইমরান : ১৪৭—১৪৮ আয়াত।

তরজমা : "তাহারা শিথিলও হয় নাই উহাতে, যাহা তাহাদের (দুঃখ-কষ্ট) ঘটিয়াছিল আল্লাহ্-তায়ালার পথে, তাহারা দুর্বলও হয় নাই এবং নতি স্বীকারও করে নাই, এবং আল্লাহ্‌তায়ালা ভালবাসেন ধৈর্য-শীলদিগকে। এবং তাহারা এ ছাড়া আর কিছু বলেও না যে 'হে আমাদের 'রাব্ব'—স্রষ্টা, প্রতিপালক ও প্রভো, মাফ কর আমাদের গোনাহ্ এবং আমাদের যাবতীয় সীমা-লঙ্ঘন (আমাদের আচরণে, চরিত্রে ও কার্যে)। আর আমাদের পা দৃঢ় কর এবং আমাদিগকে সাহায্য কর দুশমন কাফেরদিগের বিরুদ্ধে।—অনুবাদক]

হুজুর উপরোক্ত আয়াতগুলি পাঠ পূর্বক বলেন :—

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্-তায়ালা বলেন : চির কাল এমনই হইয়া আসিয়াছে যে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের জামাতে যাহারা যোগদান করে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী চিরুদ্ধবাদীগণ তাহাদিগকে দুঃখ দেওয়ার, কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। কুরআন করীমে এই দুঃখ প্রদান ও ক্লেশ দান সম্বন্ধে সবিস্তারে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। মুমেন-গণের জামাতকে রসনা দ্বারাও দুঃখ দেওয়া হইবে এবং হস্ত দ্বারাও কষ্ট প্রদানের চেষ্টা করা হইবে। আল্লাহ্-তায়ালা কুরআন করী-মের এক স্থানে মুসলমানগণকে সম্ভাষণ পূর্বক বলেন :— ان يثقفوا كم يكونوا اعداء و يبسطوا اليكم ايديهم و السنتهم بالسوء (ممتحنة : ٣) অর্থাৎ যদি তাহারা কখনো তোমাদের উপর কাবু পায় এবং তাহারা সুযোগ লাভ করে, তবে তোমাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদেব হস্তও ব্যবহার করিবে এবং রসনাও ব্যবহার করিবে।" অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন :—

و لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا اذى كثيرا - (آل عمران-١٨٧)

ফরমাইয়াছেন, "তোমরা 'আহ্লে-কিতাব (গ্রন্থধারীগণ) হইতেও এবং অংশীবাদী (মুসরিকগণ) হইতেও বহুরূপে কষ্টপ্রদ ও দুঃখদায়ক কথা শুনিবে।"

কথা দ্বারা দুঃখ প্রদানের যতটুকু প্রশ্ন, তাহা মূলতঃ দুই প্রকার। এক ত কটুবাক্য, কুবাচ্য প্রয়োগ। অর্থাৎ গাল-মন্দ দেওয়া। দ্বিতীয়, মিথ্যাচার ও জালিয়াত পূর্বক অপবাদ রটনা। এ সম্বন্ধে আমরা যখন নবীগণের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি পাত করি, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, শয়তান দুঃখ দান ও অপবাদ দেওয়ার সব চেয়ে বড় লক্ষ্য-স্থলে পরিণত করিয়াছিল আমাদের সাইয়েদ ও মৌলা হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া অলিহী ওয়া সাল্লামকে। তাঁহার (সাঃ) জীবন কালে ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁহাকে যে দুঃখ-কষ্ট দিয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাহাতে ভরপুর। তাঁহার (সাঃ) ওফাতের পর ইসলামের বিরুদ্ধা-চারীদের তরফ হইতে তাঁহার (সাঃ) প্রতি কদর্যপূর্ণ দুর্গন্ধময় অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ ক্রমাগত ধারায় চলিতে থাকে। হযরত মসীহে মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম লিখিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার (সাঃ) মিশনের বিরুদ্ধে তিন হাজারেরও উপরে অভিযোগ এ যুগে শুধু খৃষ্টানগণের দিক হইতে করা হইয়াছিল। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাম খৃষ্টান, আর্য সমাজী প্রভৃতির তরফ হইতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে উচ্চারিত গালি ও আপত্তি এক স্থানে একত্রিত করিয়াছেন, যেন মাহ্দী আলাইহিস সালামের মিশন, তাঁহার আগমন উদ্দেশ্য যখন সফল হয় এবং আপত্তিকারী-দের অস্তিত্ব কোথাও পরিদৃষ্ট না হয়, তখন ভবিষ্যদ্বংশাবলীর জন্য সেগুলি সংরক্ষিত হইয়া ইহার সাক্ষ বহণ করে যে, এক

সময়ে ইত্যাকার ভয়ঙ্কর দুঃখ-দায়ক অবস্থা ছিল। যদিও এখন ত ঐ সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। খৃষ্টানদের মোকাবেলায় ইসলাম প্রতিদিন উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে ইসলামের উপর বাতিল ধর্মগুলির আক্রমণ চলিতেছিল। কষ্ট দেওয়ার, গালী দেওয়ার একটা প্রবাহ চলিয়াছিল, যাহা আমাদের প্রিয়, আমাদের প্রভু ও নেতা (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ধারাবাহিকরূপে রাজী ছিল, এখন সেই সকল দুঃখ-দায়ক গাল-মন্দ আমরা হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী আলাইহেস সালামের বিরুদ্ধে শুনিতে পাই। কিছু লোক মহা দর্পে কুবাচ্য করে এবং তাহাদের মাথা উঁচু করে এবং তাহারা বুঝে না যে, তাহারা কি করিতেছে। ইসলাম ত সেই সুন্দর, মনোরম ধর্ম, যাহা মানুষের ছোট ছোট দুঃখ মোচনেরও নির্দেশ দেয়। যেমন, ইসলাম প্রবর্তক হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, একটি ছোট্ট নেকী হইতেছে "ইমাতাতুল আযা আনিৎ-তারীকে" (বুখারী, কিতাবুল ইমান) অর্থাৎ "তোমরা পথ হইতে কষ্ট-প্রদ জিনিষগুলি অপসারিত করিবে, যাহাতে তদ্বারা কেহ দুঃখ না পায়।" কিন্তু, এখন ত অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, কোনো কোনো লোক, রাস্তার উপর দিয়া যাইতে যাইতে অন্যের কষ্ট হউক, এরূপ বিষাদময় কথা দ্বারা দিগমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। এতদ্বারা তাহারা কার্যতঃ প্রমাণিত করে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদের আলোকে ছোট হইতে ছোট 'নেকী' করিবার তৌফিকও তাহাদের নাই।

ইতিপূর্বে আমি বলিয়াছি যে, কষ্ট দেওয়ার অন্যতম অংশ হইল 'দজল' বা মিথ্যা জালিয়াত ও প্রবঞ্চনা। খৃষ্টানরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও তত্ত্ব-তথ্যগুলি বিকৃত করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে এত 'দজল' (মিথ্যা প্রচারণা) করিয়াছে এবং ইসলামকে এরূপ বিশ্রী ও ভয়ঙ্কর মূর্তিতে পেশ করিয়াছে, ইসলাম-প্রবর্তক নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এত বিষ উদ্গারণ করিয়াছে যে, তৎফলে অনেক মূর্খ অজ্ঞ মানুষ প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না। সুতরাং, এক দিকে ত গাল-মন্দ, যাহা ইসলামের বিরুদ্ধে আমাদের শুনিতে হয় এবং অন্য দিকে প্রতারণা মূলক মিথ্যাভিযোগ যাহা আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে এই উভয় অস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। খৃষ্টান এবং অন্য কোনো কোনো বিরুদ্ধবাদী জাতি ইসলামকে এরূপ বিকৃত করিয়া দেখায় যে, আসল সত্য যাহাদের জানা নাই তাহারা তৎক্ষণাৎ প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে।...

বস্তুতঃ, এই হইল দুইটি প্রধান কষ্ট যাহা আল্লাহ্তায়ালার নবীগণ এবং তাঁহাদের জামাত সমূহকে কথায় ও কলমের দ্বারা প্রদান করা হইয়া আসিয়াছে। দুঃখ প্রদানের দুইটি অস্ত্র আছে, যাহা ইলাহী জামাতসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার

মানবতার সেই শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছে, যিনি হইলেন 'আফজলুর রুসুল'—রসুলগণের শ্রেষ্ঠ এবং যিনি চির সত্য সমূহ সম্বলিত এক সর্বাঙ্গীন মহান হেদায়েৎ সহ সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন, যিনি এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কুরআন করীমে তোমাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উপকরণ সাম্ভার রহিয়াছে। সুতরাং, ইহা বড় বিস্ময়কর বিষয় যে, কোনো কোনো ব্যক্তি এহেন জিনিষের প্রতি নির্মম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে এবং ইহার প্রতি মনোযোগ দিতেছে না, যাহা তাহাদের জন্য ইজ্জৎ ও সম্ভ্রমের যাবতীয় উপকরণ সৃষ্টি করে।

এতদ্ব্যতীত যতদূর মাল ও জানের সম্পর্ক, সেদিক দিয়াও দুঃখ দেওয়া হয়। এক সময়ে ইসলাম-বিরোধীগণ কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া বলিল যে তাহারা মুসলমানগণকে জবেহ্ করিবে। নিপাত করিবে। উৎসন্ন করিবে এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিবে। যে উদ্দেশ্যে তরবারি বাহির করা হইয়াছিল, যদিও তাহা সফল হয় নাই এবং হইবারও ছিল না, তবু ইত্যাবস্থায় তরবারি কোষ হইতে বাহির হওয়ায় ইস্‌লামের বিরুদ্ধে তরবারি যাহারা হাতে নিয়াছিল, তাহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সন্ধান ত পাওয়া গেল।

আল্লহ্তায়ালা সুরাহ্ মুমতাহেনা হইতে উদ্ধৃত আয়াতে বলেন যে, বিরুদ্ধবাদী মুখালিফগণ যখনই সুযোগ পায়, তখনই তাহারা হস্ত প্রসারণ পুর্বক তোমাদের ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করে। তাহারা ধন দৌলত লুণ্ঠনও করে, ঘর বাড়ী অগ্নিদগ্ধও করে এবং সম্পদ ধ্বংস করে। এরূপ ব্যক্তি-গণ বড়ই নাদান, অজ্ঞ ও মূঢ়া, যাহারা বুঝে না যে, ইহা এক মহা আন্দোলন, যাহা এযুগে ইস্‌লামের গালবা ও প্রধান্য লাভের জন্য প্রবর্তন করা হইয়াছে। (এবং এই যুগ বলিতে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানা বুঝায়)। এ ঐশী আন্দোলন কোনো কোনো লোকের বালকসুলভ অজ্ঞাতপূর্ণ কার্যকলাপ কিরূপে (রোধ) করিতে পারে বা ইহাতে দুর্বলতার সৃষ্টি করিতে পারে? ইহা ত তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার পরিচয়। তবু তাহারা যাহাদের বন্ধু হইয়া গিয়াছে, উহারা তাহাদিগকে ইহাই শিখায় যে, অন্যের মাল লুটপাট কর, জ্বালাও, ধ্বংস কর। গত বৎসর চীচাওতনীতে চৌধুরী নযির আহ্মদ বাজওয়া সাহেবের বাড়ীতে যখন অগ্নি সংযোগ করা হয়, তখন কিছু দিন পর বন্ধুগণ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'কি হইল?' আমি বলিলাম, 'কি হইয়াছে? যাহা হওয়ার ছিল, তাহাই হইয়াছে। একটা ঘটনা হইয়াছি, যাহা কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হইল।' আমাদিগকে আল্লাহ্-তায়ালা এই কয়েক দিনের মাধ্যই কোথা হইতে কোথায় লইয়া গেলেন! সুতরাং, আমি তাহাদিগকে বলিলাম, একটা বাড়ী ধ্বংস হওয়াতে কি যায় আসে? ইহা কি আহ্মদীয়া জামাতকে বিফল মনোরথ করিতে

পারিবে? যে ব্যক্তি এরূপ মনে করে সে নাদান ও অজ্ঞ। আমি এখনই বলিব যে, ইহাতে আমাদের দয়ার উদ্রেক হয়। ক্রোধের উদ্রেক হয় না। এবং ক্রোধ না হওয়াই উচিৎ।

বন্ধুগণ জানিতে পারেন যে এবাটাবাদে জামাতের যে সকল বাড়ী ছিল (কতকগুলি তৈরী হইয়াছিল এবং কতকগুলি তৈরী হইতেছিল, তন্মধ্যে দুই একটা আমার ব্যক্তিগতও ছিল) গত মাসে ঐগুলি পোড়ানোর চেষ্টা করা হইয়াছিল। ফলে, আনুমানিক বিশ পঁচিশ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে। কোনো কোনো বন্ধু আমাকে ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন। আমি তাহাদিগকে ইহাই বুঝাইলাম যে, দেখুন, আর্থিক দিক দিয়া বিশ পঁচিশ হাজার টাকার ক্ষতি ঘটাইয়া যদি লোকে মনে করে যে, আহ্‌মদীয়া জামাতকে ব্যর্থ ও ধ্বংস করিবে, তবে ইহা তাহাদের ভুল। এখন ত খোদার ফজলে ঐ সময় আসিয়াছে যে জামাতের মধ্যে এমন ব্যক্তিগণও আছেন যে, কোনো একজন ব্যক্তিরই এরূপ পঞ্চাশটি বাড়ী অগ্নি দগ্ধ করিলে তিনি টেরও পাইবেন না। আল্লাতায়ালার ভাণ্ডার পূর্ণ এবং তিনি আহমদীয়া জামাতকেও ধন-সম্পত্তি দিয়াছেন। সুতরাং এরূপ একব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা আর্থিক কুরবানীর তৌফিক দেন, তাহার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ ক্ষতি করিয়া লোকে যদি মনে করে যে, আহ্‌মদীয়া জামাতকে ব্যর্থ করিবে, তবে তাহাদের অবস্থা বাস্তবিকই দয়ার সঞ্চার করে।

বস্তুতঃ, বন্ধুগণের ইহা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, "বেমা আসাবাহুম ফি সাবিলিল্লাহে" ("যে দুঃখ, কষ্ট ও ক্ষতি আল্লাহর পথে তাহাদের ঘটে")—আয়াত অনুযায়ী এই সকল বিষয় আমাদের সঙ্গেও লাগিয়াই আছে। ইলাহী সেলসেলাগুলির সঙ্গে মুখালিফগণের এই ব্যবহার কোনো নূতন কথা নয়। তবু, এসব ক্ষেত্রে ইহার ভয় নাই যে, বিরুদ্ধবাদীগণের এই সব ক্রিয়াকাণ্ড আহ্‌মদীয়া জামাতকে ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ করিবে, বরং ভয় এই যে, এই সকল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জামাতের প্রতিক্রিয়া যেন কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি (রিজা) এবং তাঁহার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ না পায়। আমি প্রথমে যে দুইটি আয়াত তেলাওয়াৎ করিয়াছি, উহাদের প্রথমটিতে তিন প্রকার আশঙ্কা এবং দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলির প্রতিকারের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। ফরমাইয়াছেন 'আল্লাহ্‌তায়ালার পথে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট ঘটিবে। কিন্তু তোমাদের কর্তব্য, তোমাদের মধ্যে 'ওহ্‌ন', (وهن), 'যো'ফ' (ضعف) ও 'ইস্তেকানৎ' (استكانت) পয়দা হইতে দিবে না। আমি মনে করি, এই আয়াত এক হিসাবে আমাদের জন্য সুসংবাদেরও হেতু। তাহা এই যে, আমাদের আর্থিক ক্ষতি ঘটানোরও চেষ্টা চলিবে। কিন্তু সেই ক্ষতি আল্লাহতয়ালা এজন্য ঘটিতে দিবেন না যে, আমরা বরবাদ ও ধ্বংস হই। কারণ, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, তিনি আমাদিগকে ধ্বংস ও বধ করিবার জন্য

সৃষ্টি করেন নাই। বরং আমাদিগকে জিন্দা রাখিবার এবং আমাদের দ্বারা অন্যদেরকেও জিন্দা করিবার জন্য পয়দা করিয়াছেন। তবু, মানব স্বভাবসুলভ দুর্বলতাগুলির কারণে এরূপ স্থলে তিন প্রকারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর, যাহা হইতে আমাদের আত্ম-রক্ষার প্রয়োজন।

প্রথমে, وَهْن ('ওহন') অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কর্তব্যে 'শিথিলতা' না ঘটা। আল্লাহ্তায়ালা আম্বিয়া এবং তাঁহাদের জামাতগুলি সম্বন্ধে বলেন : فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ('ফামা ওয়াহানু লিমা আসাবাহুম্ ফি সাবিলিল্লাহ্') অর্থাৎ, "সেই কষ্টের দরুণ, যাহা আল্লাহ্রপথে তাহাদের ঘটিয়া থাকে, তাহারা শিথিল বা ভগ্নোৎসহ হয় না।" وَهْن ('ওহন')-এর অর্থ 'জুয়্ফ ফিল্ আম্রে ওয়াল্ আমলে' ('মুন্জিদ')। একটা সমষ্টিগত (ইজতেমায়ী) প্রচেষ্টার শৃংখলে যে কাজ সোপর্দ হয়, তাহাতে যেন দুর্বলতার সৃষ্টি না হয়। 'জুয়্ফ-ফিল-আম্র' প্রকৃতপ্রক্ষে 'জুয়্ফ-ফিল-আমল'-এর মূল। কর্মে যখন শক্তি ও প্রচণ্ডতার সঞ্চার হয়, তখন উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, 'আমর' বা সমষ্টিগত ভাবে ন্যস্ত কাজে শক্তি ও প্রচণ্ডতা বিদ্যমান। অর্থাৎ, উহাতে এক প্রকার ঝোঁক, অনুরাগ, প্রফুল্লতা ও ত্যাগের উন্মাদনা আছে। আহ্মদীয়া জামাত এই 'রূহানী (আধ্যাত্মিক) প্রফুল্লতা, কর্মস্পৃহা ও ত্যাগ স্বীকার এবং আত্মোৎসর্গের এক প্রকৃত আদর্শ। খোদা তায়ালা ইহাকে এজন্যই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যেন ইহা তাঁহার তওফিক ও সামর্থ্য দানে ইস্লামকে সমগ্র বিশ্বে 'গালিব' (জয়যুক্ত) করে। সুতরাং ইহা সেই মহান উদ্দেশ্য, যাহা অনুযায়ী আমরা কাজ করিব এবং ইনশা-আল্লাহ্ ইসলামকে সারা দুনিয়ায় 'গালিব' করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিব।

বস্তুতঃ, এই উৎসাহ-উদ্দীপনা ঠিক থাকা চাই। অর্থাৎ দুনিয়া চাহে এদিক হইতে ওদিক সরিয়া যাক, বা সারা দুনিয়া সম্মিলিত হইয়া আমাদের ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করুক, কিন্তু আমরা উহার কোনো পরওয়া করিব না। কারণ এই উন্মাদনা ও চিন্তাবেগে যখনই দুর্বলতা ঘটে এবং উহার ফলে মানুষ তাহার কর্মে শিথিল হয়, তখনই উহাকে وَهْن (ওহ্ন) বলে। অর্থাৎ, নৈরাশ্য ও সন্দেহের লক্ষণগুলি জন্ম নেয় এবং খোদা-তায়ালার ওয়াদা পূর্ণ হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহের উদয় হয়। যদি তাহা খোদাতায়ালার ওয়াদা হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় পূরা হইবে।

সুতরাং ইহা এক আশংকা যাহা "লিমা আসাবাহুম ফি সাবিল্লাহে-"র দিক হইতে সৃষ্টি হইতে পারে। অবশ্য এই আশংকার উদ্ভব হইতে পারে না যে, খোদার জামাত ধ্বংস হইবে। ধ্বংস হওয়া দূরে যাউক, যদি 'ওহন, 'জুয়্ফ' ও 'ইস্তেকানাতের' ফলে জামাতের একাংশ খসিয়াও পড়ে, তবুকিছু যায় আসে না।

ইলাহী মকসুদ ও মানশা (ঐশী অভিপ্রায়) সর্বাবস্থায় সফল হইবে। খোদাতায়ালা এক নূতন জাতি লইয়া আসিবেন, যাহারা সত্যিকার কুরবানী প্রদান করিবে। তাহাদের

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাহাদের নিকট অধিক প্রিয় হইবে এবং উহার মর্যাদা ও মাহাত্মের প্রতি তাহাদের অনুভূতি সদা জাগরুক থাকিবে। তাহারা খোদাতায়ালার 'আজমত' এবং তাঁহার 'জালাল' সম্বন্ধে কম্পমান ও ভীত থাকিবে। তাহারা পৃথিবীবাসীর তরফ হইতে পরিচালিত দুঃখ-ক্লেশ ও উৎপীড়নের কোনো পরওয়া করিবে না।

বস্তুতঃ, আল্লাহ্-তায়ালা বলেন যে, ঐশী জামাতের সর্বদা এই আশংকা সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে যেন 'ওহন'-পয়দা না হয়। কারণ, আমি যেমন বলিয়াছি, 'ওহ্ন' প্রকৃত পক্ষে কর্মোৎসাহ এবং জিহাদের চিন্তাবেগে দুর্বলতার পরিচায়ক। ইলাহী জামাত সমূহের মধ্যে ত এই উদ্দীপনা পাওয়া যায় যে, তাহাদের জিম্মায় দ্বীনের যে গুরুভার কার্য ন্যাস্ত, তাহা যেন তাহারা সর্বাবস্থায় পূর্ণরূপে প্রতিপালক করে, এবং আল্লহ্তায়ালার ফজল ও তাঁহার অনুগ্রহে তাহারা উহাতে সফলকাম হইবে। এই জন্যই মুমেনগণ চেষ্টা করেন যেন, এই উদ্দীপনা ও উৎসাহ কোনো সময় হ্রাস না পায় এবং ইহাতে দুর্বলতা না জন্মায়।

আল্লাহ্তায়ালা কুরআন করীমে একস্থানে 'ওহ্ন'-এর অর্থ বড়ই হৃদয়গ্রাহী রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা বলেন:

و لا تهنوا فى ابتغاء القوم (النساء : ১০৫)

"ওয়ালাতাহেনু ফিব্তেগাইল কাওমে।" অর্থাৎ তোমরা শত্রুদলের অনুসন্ধানে শৈথিল্য করিবে না।" এখন শত্রুর অনুসন্ধানে শৈথিল্য, ইহা কর্মে দুর্বলতার (ضعف فى العمل) একটি রূপ। ইহার অর্থ, তোমাদের কার্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। নতুবা আনুপূর্বিক যোগসূত্র অক্ষুন্ন থাকিবে না। সামরিক বিভাগের উদ্ভাবিত একটি বড় ভাল বাক-রীতি আছে। যখন শত্রু সম্মুখে যুদ্ধ ছাড়িয়া পিছনে হটে, তখন তাহারা বলেন, শত্রুর সহিত Contact (কন্টেক্ট) অর্থাৎ, সম্বন্ধ বজায় থাকে নাই অর্থাৎ, যখন যুদ্ধ চলিতে থাকে, তখন যুদ্ধ কালে ফৌজের মধ্যে পরস্পর একটা সম্পর্ক থাকে, কিন্তু যখন কেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়ে, তখন ইত্যাবস্থায় বলা হয়, শত্রুর সহিত সম্পর্ক (কনটেক্ট) থাকে নাই। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, যদি শত্রু তোমাদের ক্ষতি করিয়া এত দূরে চলিয়া যায় যে, তোমাদের ধৃতির বহির্ভূত হইয়া পড়ে, তবে আবার "ইবতে-গাইল কাউম" (শত্রু দলের অন্বেষণ ও পশ্চাদ্ধাবন) সম্বলিত খোদায়ী আদেশ অনুযায়ী তাহাদের পাশ্চাদ্ধাবন করিতে হইবে। ইহা তোমাদের ওহ্ন বা সিথিলতা ও অলস্যের অবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে। সেজন্য তোমরা তোমাদের শত্রুর কনটেকট বজায় রাখিতে হইবে। তাহার অনুসন্ধান ও পাশ্চাদ্ধাবন করিতে হইবে। যেখানেই থাকে এবং যে আসরেই যায়, সেখান পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইবে।

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইহা তরবারি ও এ্যাটামিক অস্ত্রসাস্ত্রের মাধ্যমে নহে। ইহা মিথ্যার বিরুদ্ধে এক রুহানী যুদ্ধ, যাহা কুরআন করীমের শিক্ষার আলোকে যুক্তির মাধ্যমে করা হইতেছে। ইহাকে 'জিহাদে কবীর' বলা হয় ইহার কিছু বিবরণ আমি পূর্বে এক জুমার খুৎবায় দিয়াছি। সুতরাং, ইহা সেই মূল ভিত্তি, যেখানে দৃঢ় থাকিতে হইবে।

আমি দেখিয়াছি এবং আমারও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও ইহাই যে. কোনো ব্যক্তি তবলীগের সময় একটা ভুল করেন এবং তাহা এই যে, ধরুন, তাঁহারা তাঁহাদের মুখালিফকে একটা যুক্তি দেন। যখন সে নিরুত্তর হয়, তখন সত্য স্বীকার না করিয়াই সেই কথা হইতে ফিরিবার চেষ্টা করে। সে এ কথা বলে না যে, যুক্তি বাস্তবিকই অকাট্য, তাহার নিকট ইহার উত্তর নাই। বরং সে বলে যে, এ সম্বন্ধে পরে আলাপ করিবে। অতঃপর, চট করিয়া আর এক তর্ক শুরু করে। অথচ, তাহার এই চালও কনটেকট' ভঙ্গ করার সমান। অন্য কথায়, এক রণাঙ্গনে যখন ভরপুর আক্রমণ চলিল, তখন সে বলে যে, না, অন্য ক্ষেত্রে যাওয়া হউক। আমি আমার পাঠ্যাবস্থায় যখন কোনো ছাত্রের সঙ্গে কথা বলিয়াছি, কোনো যুক্তি দিয়াছি, তখন নিরুত্তর হইয়া বলিয়াছে যে, পরে আলাপ করিবে, তখন আমি বলিতাম যে, না, প্রথমে আলোচ্য বিষয়ে মীমাংসা হইবে, পরে অন্য দিকে যাইব।

যাহাহউক, আমি এই বলিতেছি যে, এরূপ ক্ষেত্রে জামাতের বন্ধুগণের বলা উচিৎ, যুক্তি প্রমাণ অবশ্য দিব, কিন্তু 'কনটেক্ট' ভঙ্গ করিতে দিব না। আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা প্রথম হইবে, পরে অন্য যুক্তি দেখা যাইবে। কেহ কেহ এই কনটেক্ট ভঙ্গ করেন। ফলে, যদি কোনো ফল হইতে ছিল, তাহা নষ্ট হয়। ইত্যাকার অবস্থায় প্রতিদ্বন্দী দ্বারা একথা স্বীকার করাইতে হয় যে, তাহার কোনো যুক্তি নাই এবং সে কি অন্য যুক্তি জানিতে চায়? অতঃপর তাহার সহিত বাহাস বা তর্কালোচনা করিতে হইবে। নতুবা, যখন 'কনটেক্ট' নষ্ট হয়, তখন উহা পুনরায় নূতন করিয়া কায়েম করিতে নাই। কুরআন করীম ইহাকেও "ওয়াহ্ন" বলিয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন: 'ওয়ালা তাহেনু ফিব্‌তেগাইল কাওম।" শত্রু যখন আত্ম রক্ষা করিয়া ছত্রভঙ্গঃ হয়, তখন তাহাদের অনুসন্ধানে শৈথিল্য করিবে না, বরং 'কনটেক্ট' কায়েম রাখিবে। মনে করিবে না যে, তোমরা অল্প। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর প্রান্তরে কতক সাহাবী শহীদ ও হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে অল্প ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কি কোনো দুর্বলতা ঘটিয়াছিল? না, কখনো নয়। তেমনি আমরা পূর্বেও দুর্বল ছিলাম এখনো দুর্বল, আমাদের নিজস্ব সত্তার দিক দিয়া কিন্তু পূর্বেও আমরা শক্তিশালী ছিলাম এবং এখনো শক্তিশালী, আল্লাহতায়ালার মহিমা ও আমাদের উপর তাহার অনুগ্রহরাজির দিক দিয়া। কারণ, আল্লাহতায়ালা সমগ্র সৃষ্টির উপর ব্যপ্ত; অসীম ও মহান এবং শক্তি সমূহের তিনি মালিক। তাঁহার শক্তি ও কুদরতে ত কোনো প্রভেদ ঘটে নাই এবং কখনো ঘটিতেও পারে না।

ইস্‌লামী ইতিহাস আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও সাহায্যের সৌন্দর্য্যময় বিচিত্র ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। আমাদের ইতিহাসে এরূপ সুন্দর দৃশ্যসমূহ দেখা যায় যে, মানব বুদ্ধি সেখানে

বিস্ময় হয়। আমি পূর্বেও কয়েক বার বলিয়াছি যে, ইরান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ হয়, উহাতে হযরত খালেদ বিন অলীদ (রাঃ) -এর নিকট যথাসম্ভব মাত্র ১৪ সহস্র সৈনিক ছিলেন। তিনি এত অল্প সংখ্যক সৈন্য ভিব্যাহারে কিস্‌রার বিরুদ্ধে ইসলামের আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধার্থে ইরান সীমান্তে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁহাকে এক যুদ্ধের পর অন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তিনি কিসরার বিরুদ্ধে সাত আটটি যুদ্ধ করেন। এমন সময় খেলা-ফতের তরফ হইতে তাঁহাকে হুকুম করা হয় সিরিয়ার দিকে যাওয়ার। কারণ রোমক কৈসরের বিরুদ্ধে অভিযান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই রণাঙ্গনে সৈন্য সংখ্যাও অল্প ছিল। যাহা হউক, তখন হযরত আবু বকর রাজি আল্লাহ আন্‌হুর যামানা। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে নির্দেশ দান করিতেন। এদিকে ইরানে কিস্‌রার বিরুদ্ধে হযরত খালেদ (রাজিঃ) সাত আটটা যুদ্ধ করেন। ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয় যে, এই যুদ্ধগুলির প্রত্যেকটিতে কিস্‌রার এক একটি নূতন তাজা-দম বাহিনী উপস্থিত হইত। তাহাদের সংখ্যা দুই একটা যুদ্ধে ত চল্লিশ হাজার ছিল বলিয়া বলা হয় এবং পাঁচ ছয়টা যুদ্ধে ষাট সত্তর হাজার ফৌজের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে হযরত খালেদ (রাজিঃ)-এর বাহিনী এক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো নূতন ফৌজ পায় নাই। অর্থাৎ, কেবল মাত্র এক জন নূতন সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরিত হন। অন্য কথায়, ষাট সত্তর হাজার ইরানী ফৌজের বিরুদ্ধে চৌদ্দ হাজার মুসলমান যুদ্ধ করিতেন এবং বিজয় লাভ করিতেন।

যাহা হউক, মুসলমান সৈন্যসংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার মাত্র। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খোদার পথে শহীদও হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ত এরূপ আহত হইয়াছিলেন যে, পরবর্তী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। কেহ কেহ এমনও ছিলেন, যাঁহারা পূর্ণ দৈহিক বল সহ অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্য ছিলেন না। এই সব কিছুই ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্যে কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হইতে দেন নাই। বিরাট ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ছিল। মুহাম্মদীয় উম্মতের চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি কিস্‌রার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের 'ওয়াহ্‌ন' ঘটে নাই, কোন দুর্বলতা উপস্থিত হয় নাই। এই মুষ্টিমেয় মুসলমানগণের মধ্যে কেহ ইহা বলেন নাই যে, তাঁহাদের এত জনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। এত জন আহত হইয়াছেন। অতএব তাঁহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন না। বস্তুতঃ তাঁহাদের কাহারো মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হয় নাই। বরং, যাহারা আহত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মত্যাগের আবেগে এবং আল্লাহ্‌-তায়ালার পেয়ার ও ভালবাসা হাসিলের জন্য, আহত হওয়া সত্বেও এবং আহত বলিয়া দুর্বল হওয়া সত্বেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন এবং এইরূপে তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম দ্বারা প্রমাণিত করেন যে, সংখ্যার ন্যূনতা এবং আহত হওয়া সত্বেও তাঁহাদের কর্ত্তব্যে কোনো

দুর্বলতা সৃষ্টি হইতে পারে না। বরং প্রথম যুদ্ধে ত তাঁহারা অনেক অল্প ছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই তাঁহাদের মুকাবিলায় ইরান-সম্রাট কিস্‌রার ফৌজে সৈন্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল।

সুতরাং, 'লি-মা আসাবাহুম্‌ ফি সাবিলিল্লাহে"র দিক হইতে মুসলমান ফৌজ খোদার পথে শাহাদাত বরণ এবং অল্প বিস্তর আহত হওয়ার ফলে যে দুঃখ ও কষ্টের সম্মুখীন হইয়াছিল এবং তজ্জন্য দুনিয়ার লোকের দৃষ্টিতে তাহা দুর্বলতা বলিয়াই ঠেকিয়া ছিল কিন্তু তাহা খোদার এই পাক-প্রিয় বান্দাগণের দৃষ্টিতে দুর্বলতা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই তাঁহাদের মধ্যে না 'ওয়াহ্‌ন-ফিল্‌-আমর'-এর কোনো আলামত দেখা গিয়াছে, না 'ওয়াহ্‌ন ফিল-আমল'-এর কোন দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারা সমানভাবে মহা-বিক্রম সহ, মহা শৈষ্য-বীর্য্য সহকারে, আল্লা হতায়ালার উপর পূর্ণ 'তাওয়াক্কুল' (নির্ভরতা) সহ এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও তাঁহার অনুগ্রহরাজি ক্রমাগত আহরণ করতঃ এক রণাঙ্গন হইতে অপর রণাঙ্গনে অবতরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

তারপর, "লিমা আসাবাহুম"-এর দিক হইতে দ্বিতীয় দুর্বলতা যাহা পয়দা হয়, তাহা হইল 'জুয়্‌ফ' বা দৌর্বল্যের উপস্থিতি। অতিরিক্ত ক্রোধ বশতঃও দৌর্বল্যের সৃষ্টি হয়। 'জুয়্‌ফ' শব্দ এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পরবর্তী আয়াত হইতে প্রতিভাত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, "তাঁহার পথে তোমাদের যে দুঃখ কষ্ট সংঘটিত হয় এবং তোমাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়, উহার ফলে তোমাদের মধ্যে এক প্রকার দুর্বলতা জন্মায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তোমরা কাহারো উপর সীমা লঙ্ঘন বা অত্যাচার করিবে না। সেজন্যই হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামও ফরমাইয়াছেন :—

"গালিয়াঁ সুন্‌ কার দোয়া দো"

—"গালী শোনিয়া দোয়া দাও"।

যে ব্যক্তি গালী শোনিয়া দোয়া দেওয়ার পরিবর্তে গালী দেয়, সে তাহার মুজাহাদা বা কর্মসংগ্রামে দুর্বলতার সৃষ্টি করে। কারণ তাহার ধ্যান অন্য দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। তার পর তিনি বলেন :—

"পা-কে দুঃখ্‌ আরাম দো"

—'দুঃখ পাইয়া আরাম দাও।'

যে ব্যক্তি দুঃখ পায়, কিন্তু দুঃখ সহে না, বরং প্রত্যুত্তরে তদ্রূপই কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং বলে যে, 'তোমার খবর লইব, তুমি একটি আঘাত করিয়াছ, আমি তোমাকে দুইটি আঘাত হানিব'। এরূপ করিলে 'দুর্বলতা' সৃষ্টি হইবে। কারণ ইহাতে তাহার পক্ষ হইতে সীমা লঙ্ঘন ঘটিবে। অথচ তাহার মূল উদ্দেশ্য 'সেরাতে মুস্তাকীম' অবলম্বন। কিন্তু সে ইহাতে এদিক ওদিক সরিয়া পড়িবে এবং তাহার লক্ষ্যচ্যুতি ঘটিবে। এই দিক দিয়া দুর্বলতা ঘটিবার অর্থাৎ সীমালঙ্ঘন হওয়ার আশংকা। খোদাতায়ালা

বলেন যে, তাঁহার পবিত্র ও প্রিয় বান্দা ইত্যাকার দুর্বলতার মধ্যে জড়িত হয় না, তাহারা তাহাদের কাজ করিয়া যায়।

তৃতীয় আশংকা, 'ইস্তেকানাৎ'-এর। কোনো কোনো দুর্বল ব্যক্তি এমন থাকে, যাহাদের সম্বন্ধে আশংকা হয় যে, তাহারা কোথাও নতি স্বীকার করিয়া না বসে, এবং শত্রুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তাহার পশ্চাদগমন শুরু না করিয়া দেয়। কিন্তু সেই জামাত, যাহাকে খোদাতায়ালা 'কায়েদ' (নেতা ও পথ পথপ্রদর্শক) রূপে খাড়া করিয়াছে, উহা ত শত্রুকে ভয়ও করিবে না এবং শত্রুর পশ্চাদগমনও করিবে না। বস্তুতঃ, খোদাতায়ালা কুরআন করীম এই সব আশংকা জানাইয়া এগুলির চিকিৎসা বা প্রতিকারের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

কুরআন করীমের এই দ্বিতীয় আয়াতে যাহা আমি তেলাওয়ত করিয়াছি, এই সব আশংকা হইতে রক্ষা পাওয়ার এক দোওয়া শিখাইয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, 'অস্বীকারকারী বিরুদ্ধবাদীগণের মুখ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে যত কথাই নিঃসরণ হউক না কেন, উহার মোকাবিলায় তোমাদের মুখ দিয়া শুধু এই দোয়া নিসৃত হওয়া উচিৎ :—

"রব্বানাগ্‌ফের লানা যুনুবানা"। অর্থাৎ 'মানুষ দুর্বল, পার্থিব মাপকাঠিতে। এবং, সে বিজয়ী' আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও তাঁহার অনুগ্রহরাজির ফলে। সে ঘাবরাইয়াও পড়ে প্রত্যেক প্রকারের বিপদাপদে। শত্রু তাহাকে মানষিক, দৈহিক এবং আর্থিক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্থ করে। কিন্তু সেই ক্ষতি সে বরদাশ্‌ত করিয়া নেয়, সেই এক আশ্রয়ে, যাহা সে পায়। সেই আশ্রয়ে কি? উহা সেই রজ্জু যাহা আকাশ হইতে ঝোলে। ইহা হাবলুল্লাহ' যাহা সে ধরে এবং দোয়া করে। তাহার বিরুদ্ধে সব দুর্গন্ধ-পুতিময় জিনিষ উছলানো হয়। কিন্তু তাহার হৃদয়ে কোনো অভিযোগ সৃষ্টি হয় না। কোন অস্থিরতা হয় না। কি হইবে বা হইবে না, সে উহা নিয়া কোন পরামর্শ করে না। করাণ, সে জানে যে, কি হইবে। তাহার মুখ হইতে এই সকল দুঃখপ্রদ অবস্থায় কোনো শব্দ বাহির হয় না এই দোয়া ছাড়া যে, "রাব্বানাগ্‌ফের লানা যুনুবানা।"—'হে আমাদের রাব্ব, স্রষ্টা ও প্রতিপালক, আমাদের সব ত্রুটি ক্ষমা কর। আমাদের মধ্যে যেন 'ওয়াহন' সৃষ্টি না হয়। কারণ, 'ওয়াহন' জন্মিবার আশংকা ত্রুটির সহিতই সম্পর্ক রাখে। মানুষ দুর্বল। যাহা করা উচিৎ, তাহা সে করিয়া উঠিতে পারে না। কারণ কোনো কোনো সময় শয়তান তাহার চোখে পর্দা ফেলিয়া দেয় এবং সেই পর্দা খোদাতায়ালার রহমত ছাড়া অন্য কোনকিছু সরাইতে পারে না।

হযরত মসীহ মউওদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্‌সালাম 'মাগফেরাতের' অর্থ সম্বন্ধে বড়ই সুন্দর ধরণে আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি (আঃ) বলেন যে, যে সকল আশংকার সম্পর্ক মানব-স্বভাব-সুলভ দুর্বলতার সহিত তৎসম্বন্ধে এই দোয়া করিতে থাকা উচিৎ :

(২৫-এর পাতায় দেখুন)

হযরত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ)

ফুল প্রত্যেক ঋতুতে ফুটে না; ফলও প্রত্যেক সময় দেখা যায় না। খোদাতায়ালার নেক বান্দাও সব সময় অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় না। এদের বেশীর ভাগই এমন সময় দেখা যায়, যখন নবীর আবির্ভাব হয়। কথাটা যে বাস্তবিক সত্য তা চিন্তা করিলে বুঝা যাবে। নবী এসে সরল অন্তরে সত্যের ও জ্ঞানের বীজ এমন ভাবে বপন করেন, যার ফলে সেই ব্যক্তি ছাড়াও অপরাপরগণ উপকৃত হয়। তাদের ভিতরে এমন আন্দোলন শুরু হয়, যার ফলে অপর জন প্রভাবিত হয়। তাদের মধ্যে নূর বা আলো প্রস্ফুটিত হয়। ঐশী জ্ঞানের উৎস প্রবাহিত হয়। জন-সাধারণ তাদের জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণ করার সুযোগ পায় এবং সেই নেক বান্দার জন্য খোদার দরবারে বিনীত ভাবে প্রার্থনা জানায়।

আহমদীয়াতের ইতিহাসে মে মাস খুবই স্মরণীয়। ২৬ শে মে, ১৯০৮ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ইনতেকাল করেন। এরপর বহু ঘটনা ঘটেছে যার বিবরণের সাথে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই! ১৯৭৪-এর মে মাসও অবিস্মরণীয়। ১৯৭৭-এর মে মাসও আহ্মদীয়াতের ইতিহাসে স্মরণীয় মাস। মহা বিপ্লব ও বিষাদের মাস।

সইয়্যেদা নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা (রাঃ) ২২ শে মে দিবাগত রাত বারটা পাঁচ মিনিটে ইহলীলা সংবরণ করেন। ঠিক এক সপ্তাহ পরে ২৯ শে মে, দিবাগত রাত দেড় ঘটিকার সময় তৃতীয় ও শেষ "খালেদে আহ্মদীয়াত" মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী ৭৪ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহে....! এই হিসাবে উভয়ের মৃত্যু দিন সোমবার!

হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) তিন জন আহমদীকে 'খালেদ" খেতাব দান করেন। (১) জনাব আবদুর রহমান খাদেম এডভোকেট, (২) জনাব মৌলানা জালালুদ্দীন শামস্ এবং (৩) জনাব মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী। খাদেম সাহেবকে আমরা দেখেনি। তাঁহার বিষয়ে শুনেছি। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ের জন্য আহমদীয়া পকেট বুকই যথেষ্ট। এই কেতাব আহমদীয়াতের সত্যতার প্রমাণ ও বিরুদ্ধ বাদীদের যাবতীয় আপত্তির বিস্তারিত উত্তর। এক কথায় আহমদীয়া ইনসাইক্লোপেডিয়া। মৌলানা শামস্ সাহেবকে দেখেছি। বক্তৃতা ও দরসে কোরআন শুনেছি। হযরত মোসলেহ মাউদ (রাঃ) অসুস্থকালে তিনিই জুমার খোতবা দিতেন। বাংলাদেশেও তিনি গিয়েছিলেন। তবে অধিক সময় তাঁহার নিকট কাটাবার সুযোগ পাইনি। নতুবা বহু কিছু শিখবার সুবর্ণ সুযোগ ছিল।

আবুল আতা জলন্ধরী । বাংলা দেশের কোন আহমদী না জানেন, না চেনেন ? আমরা বাংলাদেশে এই মনীষীকে দেখেছি । তারপর রবওয়াতে একটানা একযুগ পর্যন্ত দেখছি । আলাপ করেছি । নসিহত শুনেছি ।

খোদার কুদরত, খালেদে আহামদীয়াতের তিন নক্ষত্রই মারা গিয়াছেন অতর্কিতে । শামস্ সাহেব ডাক্তারের সাথে পরামর্শের জন্য সারগোদা গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান । আবুল আতা সাহেবতো এই দিন হঠাৎ করেই মারা যান ।

আবুল আতা । আহমদীয়াতের ইতিহাসের এক অধ্যায় । আবুল আতা প্রত্যহ পাড়ার লোকদের সাথে ভ্রমনে বের হতেন ফজরের পর । অফিসে যেতেন চৌধুরী ফজল আহমদ সাহেবের মোটরে । দুজনে সমবয়সী । একই অফিসে কাজ করতেন । মৌলানা সাহেবের তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে । এক ছেলে করাচী থাকেন । বাকী তিন ওয়াকফে জিন্দেগী । আতাউল করীম লাইবেরীয়াতে । আতাউর রহীম লিয়োপলিওনে । অতোউল মুজিব জাপানে । পাঁচ মেয়ে । সবারই বিবাহ হয়েছে । ছোটটির বিবাহ হয়েছে গত জলসায় । প্রায় দুই মাস হলো স্বামীর সাথে লিবিয়া গিয়েছে । দুটি লণ্ডনে । একটি কোয়েটায় । দুইটি থাকেন রবওয়াতে । ছেলে মেয়েদের যারা রবওয়ার বাইরে তাদেরকে তার দেওয়া হয়েছে । করাচীতে আতাউর রহমান থাকেন । আমরা যখন যানাজা নিয়ে মসজিদে মোবারকে সামনে পৌছাই তখন তিনি স্ত্রী ও বাচ্চাদেরকে নিয়ে প্রায় সাতটার সময় পৌছান । লায়ালপুর এয়ারপোর্ট হতে তাকে আনবার জন্য খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোটর পাঠান হয়েছিল । নামায মগরিব আদায়ের পর হযরত সাহেব জানাযা পড়ান । হুজুর অসুস্থ থাকার দরুন বেহেস্তী মাকবেরায় যেতে পারেননি । সেখানে তিনি জির্জা আবদুল হক সাহেবকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন ।

নামাজে জানাজা মাগরিবের পর এই জন্য আদায় করা হয়, যাতে আত্মীয়-স্বজন ও নিকটবর্তী আহমদীগণ জানাযায়ে শামিল হতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ এখন এখানে তীব্র গরম পড়েছে । সন্ধ্যার সময় গরমের প্রভাব কম হয় । সকালে মির্জা আবদুস সামী, মোহাম্মদ হোসেন, বরকত আহমদ, মৌলবী আবদুল মালেক ও আমি গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে তাহার রিডিং রুমেই লাশ রেখেছিলাম । মটি রুতে ভাল করে বরফ রাখা হয়েছিল । যাতে রুমটি শীতল থাকে । সকাল হতেই লোকজন দেখতে এসেছিলেন ।

বাংলাদেশের সাথে তার বন্ধন যে কি প্রকারের ছিল তা বলা যায় না । একবার জামেয়া আহমদীয়ার হোষ্টেলে জয়ীম থাকা কালে আমি "ওসিয়তের গুরুত্ব সম্বন্ধে" বক্তৃতা করার জন্য মৌলানাকে নিয়ে গিয়েছিলাম । একটানা চল্লিশ মিনিট বক্তৃতা করলেন । একে সুদক্ষ বক্তা, তদুপরি ভাষাও প্রাঞ্জল । বক্তৃতার পর আমি বললাম যে, যদি কেহ প্রশ্ন করতে চান, তবে করতে পারেন । হেসে বললেন : মিয়া ! বক্তৃতা করার কথা

কথা ছিল না। আমি বললাম যে, আমরা তো আপনারই ছাত্র। এমন কিসের প্রশ্ন হবে যাঁর উত্তর আপনার জন্য কঠিন হবে? বললেন ভাল কথা। প্রশ্নোত্তর হবে। তবে মাছ ভাত খাওয়াতে হবে। আর মাছ ভাতের স্বাধ পেয়েছি তো বাংলাদেশে।

আমরা মছ বড় একটা খাইনা। আবার কাঁটারও ভয় আছে। তোমাদের দেপে দেশে গিয়ে এখন ইলিস মাছও ছাড়ি না। আবার এ দেশে তো মিষ্টিই নাই। যা তা স্থগারের রোগ আছে বলে খাই না। তবে বাংলাদেশের মিষ্টি বিশেষ করে রসগোল্লা কে ছাড়তে চায়? বাংলাদেশের ভাইদের মোহাব্বত ভুলবার নয়। এমন প্রানঢালা স্নেহ কেই বা করতে জানে"।

গত কয়েক বছর উভয় দেশের মধ্যে যাতায়তের অসুবিধা ছিল। প্রায়ই বলতেন," মিয়া কবে পথ খুলবে। পেরেশান হয়ে পড়েছি। দেহটা এদেশে। মনটাতো সুন্দর বন চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঢাকা আর আহমদ নগরে ঘুরছে।

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের সালানা জলসায় রবওয়া হতে বুজুর্গান পাঠানোর জন্য জনাব আমীর সাহেব হযরত আকদাশের খেদমতে আবেদন করেন। হযরত সাহেব মওলানা সাহেবের নাম মঞ্জুর করেন। ইহাতে তিনি খুবই খুশী হন। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ হতে এন, ও, সি আসা সত্বেও পাকিস্তান সরকার সময় মত কাগজপত্র দেয়নি। তাই শেষবারের মত যাওয়া হল না। প্রায়ই বলতেন, আগামী বার অনেক আগেই চেষ্টা করব। কে জানত যে আগামী জলসা তার ভাগ্যে নাই।

তিনি ছিলেস বিচক্ষণ বক্তা। একজন সুদক্ষ লেখক। পত্রপত্রিকায় লেখতেন ও দেদার বই পুস্তক লিখেছে অনেক। মাষিক আল-ফুরকানের প্রশংসা করতেন। জ্ঞানগর্ভ রচনা ইহার বৈশিষ্ট্য। সম্পাদকীয় খুবই চমকপ্রদ হতো।

একধারে আরবী মাষিক আল-বুশরার সম্পাদক ছিলেন, নিজেই লিখতেন। আর প্রুপ ও নিজেই দেখতেন। আরবী বলার ও লেখার শক্তি ছিল সমান। বক্তৃতাও করতেন অনার্গল। এক সময় আরবদেশে মিশনারীও ছিলেন বহুবৎসর। সেখানেও আল-বুশরার সম্পাদক ছিলেন। বহু মোনজেরাও করেছেন। পাকিস্তান হবার পর আহমদনগর হতে প্রথমে তিনিই তাশহীযুল আযহান বের করেন।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজে যখনই ডেকেছি অথবা যখনই রবওয়ার বাহিরে যাবার অনুরোধ করেছি; কোন ওজর করননি। খুশী মনে গিয়েছেন। সাধ্যমত জানাযায় শামিল হতেন এবং দাফনের জন্য কবরস্থানেও যেতেন। জানাযা আদায়ের ও দাফনের জন্য কবরস্থানে যাবার জন্য বহুবার তিনি লোজনকে বলেছেন। ভাই এই কাজে শামিল হও। সওয়াব হবে।

২৭ শা, মে মৌলানা সাহেবের মহল্লার খোদ্দামগণ ক্রীয়া প্রতিযোগিতা করেন। তাহার ঘরের সামনেই মাঠ। পুরস্কার বিতরনের জন্য আমি গিয়েছিলাম। খেলা শুরু হবার একটু পূর্বেই তিনি এসে হাজির। পাঞ্জাবী সেলওয়ার পরা ছিলেন, পাগড়ী ছিল না। আমি বললাম, মৌলবী সাহেব এখানে এসে বসুন, বললেন না বেটা, তুমি এখন মেহ-

মান হিসাবে এসেছ। তুমি আমারও মেহমান। যাবার সময় চা খেয়ে যেয়ো। আমি বুড়ো বলে তোমরা আমায় ডাকনি। তা খেলার বয়য়তো নেই বটে, তবে দেখবার কৌতুহল কমেনি

মহল্লার প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান সিদ্দীকি সাহেবকে বললেন যে, খোদ্দাম ও আতফালের খেলা হচ্ছে আপনার মহল্লায় পুরস্কার বিতরণের জন্য মেহমান এসেছে বাংলাদেশ হতে। এখন মেহমানের খাতির হওয়া দরকার। হযরত সাহেবের এলহাম আছে "বাঙ্গালীদের দিল জয়ী হবে"। মারকাজের অন্যান্য মেহমানদের খাতির তোয়াজ করুন। আপনাদে ফাণ্ডে টাকা না থাকলে পয়সাটা নচেৎ আমি দেব। এর-পর কোকাকোলা আনিয়ে আমাদেরকে পান করিয়েছেন এবং নিজেও পান করেছেন।

খুশী হয়ে বলেছেন এখন রবওয়ার খোদ্দামগণ জেগেছে। সকল মজলিসে খেলা হয়। এতে যুবকদের স্বাস্থ্য ভাল হবে এবং কাজও করবে উদ্দমের সাথে! আজ বিকালটি আনন্দ করেই কাটালাম। খেলাও দেখলাম এবং কোকাকোলাও পান করলাম। একটু পরেই মাগরিবের আযান হওয়াতে তিনিও চলে যান আর আমরাও মসজিদে মোবারকে চলে আসি। সেখানে মৌলানার সাথে ভটো তুলেছি। আমার জানা মতে এটাই তার জীবনের শেষ পাটি। ২৮ তারিখ অফিসে এসেছিলেন। কাজও করেছেন এবং আঞ্জুমানের মিটিং-এ হাজির ছিলেন। সোমবারের সূর্য্য তার জন্য উদয় হয়নি।

কয়েক বৎসর তিনি আহমদীয়া মুস্লিম মিশনারী কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তফসীর, হাদীস, ফেকাহ কালামে ছিলেন মহা পণ্ডিত। রমজানের সময় মসজিদে মোবা-রকে কোরআনের দরস দিতেন নামাজ বা জামাত আদায়ের প্রতি খুবেই লক্ষ রাখতেন। এই জন্য ঘরে তিনি নামাজের টাইম-টেবল লটকিয়ে। যখনই নামাজের সময়ে মসজিদে কোন পরিবর্তত করা হতো, তখন তিনিও নিজের টাইম টেবিলে পরিবর্তন করতেন।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য গিয়েছিলেন, তখন তিনিও হযরত সাহেবের উপদেষ্টা হিসাবে গিয়ে-ছিলেন। হযরত সাহেবও তাহাকে প্রানঢালা স্নেহ করতেন। আমরা মরহুমের মাগফেরাত কামনা করে খোদার নিকট মোনাজাত করিতেছি। হযরত মৌলানা সাহেবের জীবন ইহারই জলন্ত দৃষ্টান্ত দিচ্ছে যে, তাহার জীবনের সকল সফলতা ইমামের এতায়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

—মাহ্মুদ আহ্মদ (রাবওয়া)

আহ্মদী ১৫ই জুলাই—১৯৭৭ ইং

খোৎবার অবশিষ্টাংশ

(২০ এর পাতার পর)

'খোদা! আমি মানুষ ও সর্বাবস্থায় দুর্বল। এমন না হয়, আমার প্রকৃতিগত দুর্বলতা আমার রূহানী উন্নতির পরিপন্থি হয়। হে খোদা! এমন কর যেন আমার কোনো ত্রুটি সংঘটিত না হয়।" সুতরাং, 'ওয়াহ্‌ন'-এর সম্বন্ধ যেহেতু ত্রুটির সহিত, সেই জন্য এই দোয়া শিখান হইয়াছে যে, "তোমরা 'ওয়াহ্‌ন' হইতে রক্ষা পাইতে চাহিলে, তোমাদের প্রচেষ্টার জন্য 'অহঙ্কার, (তকব্বুরী) করিবে না। তোমাদের কুরবানী, আত্ম-ত্যাগ ও আন্তরিকতার দরুন অহঙ্কার-স্ফীতি হইবে না। 'ওয়াহ্‌ন' হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমাদের লাভ করিতে হইবে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য। তাঁহার সাহায্য লাভের জন্য তোমাদিগকে এই দোয়া শিখাইতেছি।"

যাহা হউক, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'তোমাদের বল বিক্রমে 'ওয়াহ্‌ন' হইতে রক্ষা পাইতে পার না। আমার সাহায্য লাভের জন্য তোমাদের এই দোওয়া করিতে থাকা উচিৎ: রাব্বানাগাফের লানা যুনুবানা।" —হে খোদা! আমাদের যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশিত বা সংঘটিত হইয়াছে, ঐগুলির কুফল হইতেও আমাদিগকে রক্ষা কর এবং আমাদের জন্য এমন বিহিত কর যেন আমাদের মধ্যে মানব স্বভাব সুলভ দুর্বলতার ফলে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, তাহাও যেন সৃষ্টি না হয়। যদি তোমরা এই দোওয়া কর, আল্লাহ্‌তায়ালার যখন এই দোয়া কবুল করিবেন, তোমাদের মধ্যে 'ওয়াহ্‌ন' অর্থাৎ দুর্বলতা সৃষ্টি হইবে না।

দ্বিতীয় আশংকা 'যোয়্‌ফ' পয়দা হওয়ায়। অর্থাৎ, যোয়্‌ফের ফলে সীমাতিক্রম সংঘটিত হয়। ইহার মোকাবিলায় আল্লাহ্‌তায়ালা এই দোয়া শিখাইয়াছেন:—

"ওয়া ইস্‌রাফানা ফি আমরেনা।"

—"হে খোদা! আমাদের সীমাতিক্রম ক্ষমা কর।" আমি বলিয়াছি যে, যোয়্‌ফের অবস্থায় মুমেন ব্যক্তি কোনো কোনো সময় সীমাতিক্রম করে। যেমন, নির্যাতনের সময় দোয়া দেয় না বা দুঃখ পাইয়া সুখ পৌঁছাইবার চেষ্টা করে না, বরং, দুঃখের বদলে দুঃখ দেয়। গালীর মোকাবিলায় গালী দেয়। সুতরাং, খোদার বান্দা যখন ইত্যাকার কর্ম করে, তখন ইহা তাহার পক্ষে সীমা-লঙ্ঘনে পরিগণিত হয়। এই সীমাতিক্রম হইতে রক্ষা লাভের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা এই দোয়া শিখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তোমরা সর্বদা এই দোয়া করিতে থাকিবে: 'ওয়া ইস্‌রাফানা ফি আমরেনা।' --হে খোদা! আমাদিগকে এই প্রচেষ্টা ও মুজাহাদা, যাহা তোমার ধর্মের 'গালবা' বা প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে শুরু করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে আমরা যেন 'সীমা লঙ্ঘন' (ইসরাফ) জনিত গোনাহ্‌তে লিপ্ত না হই। তাহা হইতে আমাদিকে রক্ষা কর।'

তৃতীয় আশংকা 'ইস্তেকানাৎ' অর্থাৎ, শত্রুর নিকট নতি স্বীকার এবং তাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া তাহার পশ্চাদানুসরণের আশংকা। ইহা ইমানের দুর্বলতার লক্ষণ। এইরূপ লোকদের সম্বন্ধে কুরআন করীমে বিস্তৃত উল্লেখ আছে। তাহারা বলে, 'জী, আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি। আমরা মুসলমানের সঙ্গেও আছি, মুনাফিকদের সঙ্গেও আছি। আমরা কাফের অবিশ্বাসী এবং ইসলামের শত্রুদের সঙ্গেও বুঝাপড়া করিতেছি এবং সকলকেই বলি যে, তোমরা জয়ী হইলে আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকিব।' আমি ইহার বিস্তৃত বিবরণের দিকে এখন যাইতে পারি না। মূল সূত্র হিসাবে বলিতেছি যে, এই গোনাহ্ ও দুর্বলতা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্-তায়ালা ফরমাইয়াছেন: তোমরা এই দোয়া করিবে:—

"ওয়া সাব্বেৎ আকদামানা।"

—"খোদা! আমাদের পা দৃঢ় কর।" ফরমাইয়াছেন, 'শুধু তোমাদের চেষ্টায় তোমরা দৃঢ়-পদ হইতে পারিবে না। আল্লাহ্র অনুগ্রহে ও আল্লার ফজলের দ্বারাই তাহা সম্ভবপর। এজন্য তোমরা এই দোয়া করিতে থাকিবে, "আমাদের পা মজবুত কর।"

বস্তুতঃ, যখন এই সব দুর্বলতার আশংকা বাকী না থাকে এবং "এব্তেগাইল্ কাওম"—শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের শক্তি লাভ হয়, তাহাদের সঙ্গে "কনটেক্ট্" রক্ষা করিবার এবং যুদ্ধ করিবার দিক হইতে; তারপর, সীমাতিক্রমও হয় না, বরং মুমেনগণ সবুর করিয়া ধৈর্যের সহিত চলে—'গালীর' পরিবর্তে তাহারা দোয়া দেয় এবং দুঃখ পৌঁছানোর মোকাবিলায় সুখ পৌঁছানোর উপায় অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট এই দোয়া করিবার ফলে নিজদিগকে শত্রুর সম্মুখে অবনত ও নীচু করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকারের পরিবর্তে কথায় ও কাজে দৃঢ়-পদ হয়, তখন আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও রহমতের ফলে, তাহারা যেখানে দাঁড়াইবে, সেখানে তাহাদের পা স্খলিত হইবে না। তাহারা শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়াইবে এবং তাহাদের কোনো পরওয়া করিবে না এবং বলিবে, 'তোমরা সংখ্যায় অধিক। তা হও। তোমাদের অর্থ অনেক। হউক তা। ইহাতে আমার ইমানের আবেগ ও উদ্যম এবং কর্ম-স্পৃহায় কোন প্রভেদ ঘটিতে পারে না। আমি ত খোদা-তায়ালার সিপাহী। যেখানে দাঁড়াইয়াছি সেখান হইতে পিছনে সরিব না। আগে বাড়িব। কারণ আমি ঐ জামাতের সাথে কম্পৃক্ত, যাহাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য পয়দা করা হইয়াছে।" সুতরাং মুমেনের আমলে দৃঢ়তা থাকে। তাহার পা কখনো স্খলিত হয় না। পর্বত স্থানান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু মুমেনের পা কখনো উহার স্থান হইতে টলে না। মুমেন পিছনে হটে না। সে তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে।

যখন এই সবই হইয়া পড়ে, তারপরও আল্লাহতায়ালা বলেন যে, দেখ, তোমরা এই সব আশংকা হইতে রক্ষা লাভের জন্য দোয়া

করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই দোয়াও করিতে থাকিবেঃ

'ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফেরীন' 'খোদা! কাফের লোকদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য দান কর।' আমি পূর্বেও ইশারা করিয়াছি যে এই তিনটা আশংকার পরে একটা চতুর্থ আশংকার সৃষ্টি হয়। উহা হইল তকব্বুরি বা অহংকার অর্থাৎ মানুষ সব কিছুই লাভ করিয়াছে, আল্লাহতায়ালার হুজুরে অবনত মস্তক সকাতর প্রার্থনা ও দোয়ার ফলে কিন্তু সফলতার সময় শয়তান উপস্থিত হয় এবং বলে যে, তোমরা এই সফলতা তোমাদের চেষ্টা, তোমাদের হিম্মৎ এবং শক্তি দ্বারা লাভ করিয়াছ। ইত্যাবস্থায় পূর্বেকার দোয়াগুলি কবুল হওয়া সত্বেও আংশকা হয় যে, কোথাও আবার বিফলতা ও ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি না হয়। সেজন্য আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, এই সব দোয়ার পরে এবং আমার অনুগ্রহরাজি লাভ করিবার পর এই দোয়াও করিবেঃ

"ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফেরীন"

'খোদা! কাফেরদের মোকাবেলায়, ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলয় তোমার সাহায্য ছাড়া আমাদের বিজয় লাভ করা সম্ভবপর নহে। আমাদিগের এই বিজয় আমাদের কোন শক্তি, কোন ক্ষমতা, আমাদের পায়ের দৃঢ়তা বা আন্তরিকতা ও ত্যাগের ফলে লাভ হইতে পারে না। সেজন্য খোদা! তুমি স্বয়ং আমাদের সাহায্যার্থে আইস এবং আমাদের ও তোমার শত্রুদিগকে তাহাদের এই সব কুচক্র ও পরিকল্পনাতে ব্যর্থ কর।

বস্তুতঃ যখন খোদার বান্দা এই দোয়া করে, তখন শয়তানের সর্ব প্রকার কুমন্ত্রণা হইতে নিরাপদ হয় এবং তাহার 'খাতেমা-বিল-খায়ের (শেষ মঙ্গল) হয়। যখন সব কিছু পাওয়া গেল তখন কিসের ভয়, যখন মানুষ শয়তানকে পরাজিত করে, তখন শয়তানের দিক হইতে তাহার কোন আশাংকা থাকে না। যাহার মাথা সেজদা হইতে উঠেই না এবং যাহার মাথা সর্বদা আল্লাহতায়ালার হুজুরে ঝোকা থাকে, তাহার কুণ্ঠদেশ পর্যন্ত শয়তানের অস্ত্রাঘাত কিরূপে পৌঁছিতে পারে? সে তো নিরাপদ হইয়া পড়ে।

আমাদের জামাত আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে দোয়া করে এবং তাঁহারই হিফাজতে আছে। তবু আমাদের কখনো কখনো স্বরণ করানোর প্রয়োজন হয়। কারণ শত্রু অন্যও এবং আমাদের মধ্য হইতেও আছে, যাহারা আমাদের সঙ্গেই লাগিয়া আছে। এই সব লোক বড়ই ক্রোধান্বিত হয়। এজন্য যে, এই জামাত খোদার ফজলে ইসলামের বিশ্বজনীন প্রাধান্য বিস্তারের একটা সফল প্রচেষ্টা করিয়া যাইতেছে, এক অত্যন্ত বিজয় সুলভ মুজাহাদা করিয়া যাইতেছে।

সুতরাং আমাদের রাগ হওয়া উচিত নয়। আমাদের বিরুদ্ধাচারীগণ যত ইচ্ছা আমাদিগকে কষ্ট দিক, দুঃখ দিক হাতে ও মুখেও, মিথ্যা অপবাদ দ্বারা, দজল ও প্রবঞ্চনা করিয়া, যেমন খৃষ্টানগণ করিয়া থাকে, আমাদের ধন সম্পত্তি নাস, লুণ্ঠন ও পোড়ানোর চেষ্টা বা আমাদের প্রাণ হানি করিয়া, মোটকথা যাহা ইচ্ছা তাহারা করুক ; হইবে তাহাই, যাহা খোদা চাহিবেন এবং খোদা এই চাহিয়াছেন যে, আহমদীয়াত চিরদিন গালিব থাকিবে, তাঁহারই অনুগ্রহে ও ফজলে এবং তাঁহার প্রদত্ত সামর্থ্যে। —ইনশা আল্লাহ।

(দৈনিক 'আলফজাল' ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭৩)

অনুবাদঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস আনসারুল্লার অনুষ্ঠিত বার্ষিক ইজতেমা

বিগত ১২-৬-৭৭ ইং রোজ রবিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে আনসারুল্লার বার্ষিক ইজতেমা করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার খাস ফজলে সু-সম্পন্ন হইয়াছে। এই রূহানী ইজতেমায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঘাটুরা, ভাতুঘর ও ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত হইতে ৪০ জন আনসার যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্র ৩-৩০ মিনিট হইতে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাজ দ্বারা ইজতেমা আরম্ভ করা হয়। মহ্‌তারম আমির সাহেব বাঃ আঃ আঃ দরসে কোরআন, উদ্বোধনী ভাষণ ও সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করিয়া এই রূহানী সমাবেশকে বিশেষ আকর্ষণীয় করিয়া তোলেন। তিনি এই ইজতেমাতে যোগদান করার জন্য যে তকলিফ স্বীকার করিয়াছেন সে জন্য ইজতেমায় আগত সকল আনসার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ

জনাব মৌঃ সৈঃ ইজাজ আহমদ সাহেব তরবিয়তে আওলাদ এবং জনাব মৌঃ সলিমউল্লা সাহেব খাতামান্নাবিয়ীন-এর মর্মার্থ সহ রসুল করীম (দঃ) এর জীবনী সম্বন্ধে সার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

এ ছাড়া ইজতেমাতে দরসে হাদিস শরিফ প্রদান করেন জনাব মোয়াল্লেম শামসুজ্জামান এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কেতাবের দরস প্রদান করেন জনাব মোঃ ইদ্রিস সাহেব প্রেঃ আঃ আঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। আনসারুল্লাহ্‌র কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন জনাব ডাঃ আনওয়ার হুসেন সাহেব, জয়ীমে আলা, মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

মহ্‌তরম আমির সাহেব সন্ধা ৬ ঘটিকায় দীর্ঘ ইজতেমায়ী দোয়ার পর ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এই রূহানী সম্মেলনে ঘাটুরা গ্রামের এক নওজোয়ান মহ্‌তারম আমির সাহেবের নিকট বয়াৎ গ্রহণ করিয়া আমদীয়া সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। বন্ধুগণ আমাদের এই নও-ভ্রাতার ইমানের মজবুতী ও দীন-দুনিয়ার কামিয়াবীর জন্য খাস ভাবে দোয়া করিবেন।

কটিয়াদী জামাতের কর্মতৎপরতা

বিগত ১৯/৬/৭৭ ও ২০/৬/৭৭ তারিখে রোজ রবি ও সোমবার স্থানীয় আহমদীদের উদ্যোগে আহমদীয়তের পয়গাম ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার কর্মসূচীর উপর দুইটি অধিবেশনের বন্দোবস্ত করা হয় স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ ইজাজুল হক কবিরাজ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস আনসারুল্লার অনুষ্ঠিত বার্ষিক ইজতেমা

বিগত ১২-৬-৭৭ ইং রোজ রবিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে আনসারুল্লার বার্ষিক ইজতেমা করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার খাস ফজলে সু-সম্পন্ন হইয়াছে। এই রূহানী ইজতেমায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঘাটুরা, ভাদুঘর ও ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত হইতে ৪০ জন আনসার যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্র ৩-৩০ মিনিট হইতে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাজ দ্বারা ইজতেমা আরম্ভ করা হয়। মহ্তারম আমির সাহেব বাঃ আঃ আঃ দরসে কোরআন, উদ্বোধনী ভাষণ ও সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করিয়া এই রূহানী সমাবেশকে বিশেষ আকর্ষণীয় করিয়া তোলেন। তিনি এই ইজতেমাতে যোগদান করার জন্য যে তকলিফ স্বীকার করিয়াছেন সে জন্য ইজতেমায় আগত সকল আনসার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ

জনাব মৌঃ সৈঃ ইজাজ আহমদ সাহেব তরবিয়তে আওলাদ এবং জনাব মৌঃ সলিমউল্লা সাহেব খাতামান্নাবিয়ীন-এর মর্মার্থ সহ রসুল করীম (দঃ) এর জীবনী সম্বন্ধে সার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

এ ছাড়া ইজতেমাতে দরসে হাদিস শরিফ প্রদান করেন জনাব মোয়াল্লেম শামসুজ্জামান এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কেতাবের দরস প্রদান করেন জনাব মোঃ ইদ্রিস সাহেব প্রেঃ আঃ আঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। আনসারুল্লাহ্র কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন জনাব ডাঃ আনওয়ার হুসেন সাহেব, জয়ীমে আলা, মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

মহতরম আমির সাহেব সন্ধা ৬ ঘটিকায় দীর্ঘ ইজতেমায়ী দোয়ার পর ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আল্লাহ্তায়ালার ফজলে এই রূহানী সম্মেলনে ঘাটুরা গ্রামের এক নওজোয়ান মহতারম আমির সাহেবের নিকট বয়াৎ গ্রহণ করিয়া আমদীয়া সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। বন্ধুগণ আমাদের এই নও-ভ্রাতার ইমানের মজবুতী ও দীন-দুনিয়ার কামিয়াবীর জন্য খাস ভাবে দোয়া করিবেন।

কটিয়াদী জামাতের কর্মতৎপরতা

বিগত ১৯/৬/৭৭ ও ২০/৬/৭৭ তারিখে রোজ রবি ও সোমবার স্থানীয় আহমদীদের উদ্যোগে আহমদীয়তের পয়গাম ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার কর্মসূচীর উপর দুইটি অধিবেশনের বন্দোবস্ত করা হয় স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ ইজাজুল হক কবিরাজ

সাহেবের একটি নব নির্মিত দোকানের উদ্বোধন উপলক্ষেই এই বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে ময়মনসিংহ আঞ্জুমন হইতে আগত আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব ও অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এবং মানব ধর্ম ইসলাম ও আহমদীয়াতের উপর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। স্থানীয় জামাতের বিশিষ্ট সদস্য জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় উল্লেখ-যোগ্য পরিমাণ অন্যান্য মুসলমান ও হিন্দু বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুরূপভাবে ২০/৬/৭৭ তারিখে সকাল ১১টায় আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের সভা-পতিত্বে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাংগঠনিক ও তরবিয়তি কার্যক্রমের উপর ফলপ্রসু আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরফ হইতে এক চা-চক্রের আয়োজন করা হয়।

লাজনা ইমাউল্লাহর তৎপরতা

তেজগাঁ ঃ

গত ২৯ শে জুন, রোজ বুধবার তেজতুরী বাজারস্থ মৌঃ ওবায়দুর রহমান সাহেবের বাসভবনে তেজগাঁ লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রী ছিলেন মিসেস রাবেয়া লতিফ। ভগ্নিগণের উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল। বৈকাল ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। তেলাওয়াতে কোরআনের মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ হয়। তেলাওয়াত করেন মিসেস শওকত আরা বেগম। অতঃপর হাদিস হইতে পড়িয়া শোনান মিসেস বুশরা হক। মিসেস লায়লা রহমান হযরত সৈয়েদা মোবারকা বেগম সাহেবা (রাঃ)-এর জীবনীর উপর আলোকপাত করিয়াও বক্তব্য রাখেন। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর পুস্তক 'ফতেহ ইসলাম' হইতে পড়িয়া শোনান মিসেস রাবেয়া লতিফ এবং উহার আলোকে মূল্যবান আলোচনা করেন। অতঃপর তালিম তরবিয়তী আলোচনা হয়। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

ময়মনসিংহ

বিগত ২০-৫-৭৭ তারিখ বাদ জুমআ ময়মনসিংহ আহমদীয়া মসজিদে লাজনা ইমা-উল্লাহ্‌র এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা, আশীষ এবং বরকত সম্বন্ধে আলোচনা করেন আমাতুন নূর বুশরা, লৎফুন্নেছা বেগম, ডাঃ লায়লা আর্জুমান্দ। সভানেত্রীত্ব করেন লাজনার প্রেসিডেন্ট রেহানা চৌধুরী। সভার প্রারম্ভে কোরআন তেলায়াত করে ছোট মেয়ে (সাড়ে চার বৎসর বয়স) আমাতুস সামী ফারহাত।

আহ্মদীয়া জামাতের
ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইমুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়্যেদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar